ফেব্রুয়ারী '৮৪

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

ফ্যাণ্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা
পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮১ পৃঃ ৯৫ দাম ৮·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ঘনাদার জুড়ি নেই
ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮১ পৃঃ ৯৬ দাম ৮·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ চারমূর্তি
৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ৯২ দাম ৮·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ঝাউবাংলোর রহস্য
নতুন সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ৭০ দাম ৮·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ কম্বল নিরুদ্দেশ
১ম সংস্করণ, ১৯৮০ পৃঃ ৭৬ দাম ৬·০০

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ॥ গুপী গাইন বাঘা বাইন
২য় সংস্করণ, ১৯৮১ পৃঃ ৪৭ দাম ৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ হাতিচোর
২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ পৃঃ ৯৬ দাম ৮·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
১ম সংস্করণ, ১৯৮০ পৃঃ ১১২ দাম ৮·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রামধনু
১ম সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১০৮ দাম ১০·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের মজার গল্প
নতুন সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ৯২ দাম ৬·০০

কিশোর ক্ল্যাসিক্স্

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ তেপান্তর
১ম সংস্করণ, ১৯৮০ পৃঃ ২৫২ দাম ২০·০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ ছোটদের কাশীনাথ
১ম সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ৯৯ দাম ৮·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কিশোর অপু
১ম সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ৩২৮ দাম ২০·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অপুর ছেলেবেলা
১ম সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ১১৬ দাম ১০·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের অপরাজিত
২য় সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ৯৫ দাম ১০·০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের কাজল
২য় সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ১০৪ দাম ১০·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা
১ম সংস্করণ, ১৯৮১ পৃঃ ১০৬ দাম ৮·০০

বুদ্ধদেব বসু ॥ অপরূপ রূপকথা
নতুন সংস্করণ, ১৯৮১ পৃঃ ১৪৮ দাম ১০·০০

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ বাংলার ডাকাত ১-৪
নতুন সংস্করণ, ১৯৮১-৮২ পৃঃ ৪২৮ দাম ৩২·০০ সেট্

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ মহিম ডাকাত
নতুন সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ১২৭ দাম ১০·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ঘনাদা বিচিত্রা
১ম সংস্করণ, ১৯৮১ পৃঃ ২১৪ দাম ২০·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ টেনিদার অভিযান
২য় সংস্করণ, ১৯৮০ পৃঃ ২৩৮ দাম ২০·০০

শৈব্যা প্রকাশন
৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

3য় বর্ষ 10ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী 1984
প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহঃ সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

এই সংখ্যাতেও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা প্রকাশিত হল। অনেকেই চিঠি লিখে ভূগোল, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ের উপরে লেখা প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেছে। এ নিয়ে আমরা আলোচনা করে পরে সিদ্ধান্ত নেব। তবে এ বছরে কিছু করা সম্ভব হবে না। সম্প্রতি বিহারের রাঁচী শহরে সায়েন্স কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। এ বিষয়ে পরে আলোচনা প্রকাশিত হবে।

নতুন ক্লাসে উঠে নতুন বইপত্র পেয়ে নিশ্চয়ই তোমরা খুশী। বছরের প্রথম থেকেই মন দিয়ে পড়শোনা শুরু করে দাও।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় 1
চিঠিপত্র 2

দপ্তর থেকে
শীতের পাখিরা ॥ রবীন বল 4

বিশেষ রচনা
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ॥ সবিতা ধর 43

পড়াশোনা
পদার্থবিদ্যা ॥ অলক চক্রবর্তী 12
ঐচ্ছিক জীববিদ্যা : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ॥
দিনোজকুমার দে 20
বীজগণিতীয় পদ্ধতি ব্যবহারে সতর্ক হওয়া উচিত ॥
অসীম মুখোপাধ্যায় 21
রসায়নে কি ও কেন ? ॥ অমরনাথ রায় 29
জীবন বিজ্ঞানের আলোচনা ॥ তারকমোহন দাস 31
সংখ্যা নিয়ে লুকোচুরি খেলা ॥ দীপক চক্রবর্তী 40

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প
সবুজ পরী ॥ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 17

উপন্যাস
সবুজ বনের গান ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 33

আবিষ্কারের কাহিনী
মরা হাড়েও কথা বলে ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 45
ক্রোমোজোমের গঠন ॥ সুব্রতকুমার চৌধুরী 37

নিজে কর
টাইম সুইচ্ 6

পশু পাখি কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ
পূর্ণপ্রিয় বংশ : মোহনচূড়া ॥ অজয় হোম 41

ছড়া
বিবর্তন ॥ সুদীপ্ত দাসগুপ্ত 48

ছবিতে গল্প
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 25
খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 26
জুলে ভার্নের টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগ্স আণ্ডার দি সী ॥ গৌতম কর্মকার 28
হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা ॥ ধীরেন বল 56
প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 44
মজার ছবি ॥ প্রণব হোড় 14, 30
মিনি বাসে বিপদ ॥ উজ্জ্বল ধর 24

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
শীতের আকাশ ॥ বিমান বসু 9
বিচিত্র গাছ আজও বিস্ময় ॥ পথিক মণ্ডল 15
জোনাকির আলো ॥ অলিভকুমার ঘোষ 16
ইউরিয়া ॥ প্রভাস দাস 32
কিডনী ট্রানসপ্লাণ্টেশন ও ডায়ালিসিস ॥
শচীনন্দন আঢ্য 38
জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ 47
মনু মাছ ॥ ধীরেন দত্ত 39

ছোটদের দপ্তর
নলেজ কুইজের উত্তরদাতাদের নাম 49
নলেজ কুইজ : জানুয়ারি নলেজ কুইজের উত্তর 50
শব্দকূট ॥ দেবাশিষ কর 55
গত সংখ্যার শব্দকূটের উত্তর 52
ভেবে ভেবে বল ॥ শুভব্রত রায়চৌধুরী 51
জানা-অজানা ॥ বিশ্বজিৎ মণ্ডল 50
ভেবে ভেবে বলোর উত্তর 7
প্রশ্নোত্তর ॥ অজয় চক্রবর্তী 52
বিংশ শতাব্দীর বিস্ময় ॥ ইন্দ্রনীল ঘোষ 53
রোবোটদের সম্মেলন ॥ পল্লব মোহান্ত 54

ছবি এঁকেছেন : অজয় ঘোষাল।

ঘনাদা-ক্লাব

শ্রীরবীন বল

পরম প্রীতিভাজনেষু রবীন,

তোমাদের 'ঘনাদা ক্লাব' বেশ জমে উঠেছে লিখেছ। এ খবরে নির্বিকারে থাকব, বৈরাগ্যের এমন উঁচু ধাপে আমি উঠিনি, উঠতে চাই-ও না। ঘনাদাকে আমার পাঠকেরা যে ভালবাসে তা আমার অজানা নয়। কিন্তু তোমাদের 'ঘনাদা ক্লাব' মারফৎ সে ভালবাসার যে সব আশ্চর্য ও মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত প্রমাণ পাচ্ছি তাতে অভিভূত হইনি বললে মিথ্যে বলা হবে। বেঁচে থাকতেই 'ঘনাদা ক্লাব' দেখে গেলাম, এটা একটা কম সৌভাগ্য নয়।

'ঘনা-দা ক্লাবের' বিষয়ে সাত থেকে সাতাশী পর্যন্ত বয়সের বহুজনের উৎসাহের কথা লিখে তুমি এ ক্লাবের সভ্য হবার নিয়ম টিয়ম সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে কিনা জানতে চেয়েছে। আমার বলার'ত শুধু এই আছে যে ঘনাদাকে যারা ভালবাসে, ক্লাবটা যখন তাদের তখন সভ্য হ'তে যারা চায় তাদের জন্যে ঘনাদা সম্বন্ধেই কে কতখানি বিশারদ তা বোঝবার মত দশটা প্রশ্ন রাখলে কেমন হয়? দশটা প্রশ্নের মধ্যে সাতটার যে সঠিক উত্তর দেবে সে বিশেষ সভ্য বলে গণ্য হবে। সাধারণ সভ্য হবার জন্যে তিনটে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারাই যথেষ্ট। আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখো। আন্তরিক প্রীতি নিও। ইতি শুভার্থী

57 হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-700 026

ঘনাদা ক্লাবের সদস্যপত্রের জন্য আরও যাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন

29. প্রণবকুমার মজুমদার, ভবানীপুর, খড়্গপুর, মেদিনীপুর, পিন-712301।

30. দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বাঁকুড়া গোয়েঙ্কা বিদ্যায়তন, নন্দী হোটেল, বাঁকুড়া, পিন-722101।

31. হিমাদ্রিশেখর আদিত্যচৌধুরী, 10/18 কবি ভরতচন্দ্র রোড, দমদম, কলি-28।

32. প্রণবকুমার সরকার, সুপর্ণা সরকার ও রুমকি সরকার, 24 মল্লিকপাড়া লেন, দমদম, কলি-55।

33. শ্যামসুন্দর ও ব্রজগোপাল সাহা, সোনামুখী, বাঁকুড়া, পিন-722207।

34. ভাস্কর সিন্‌হা, 19/68 আকবর রোড, দুর্গাপুর, বর্দ্ধমান, পিন-713204।

35. কাঞ্চন মুখার্জী, সৌখিন মেস, বর্দ্ধমান।

36. তাপস ব্যানার্জী, দুর্গাপুর—10, বর্দ্ধমান।

37. রাজা আচার্য, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-35

চিঠিপত্র

শ্রীদেবাশিষ করের চিঠির উত্তর

গত ডিসেম্বর '83 সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীকরের চিঠিতে মূলত যে তিনটি প্রশ্ন ছিল, তার সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হলোঃ

প্রথমত, 'শূন্য সমুচ্চয়' পদ্ধতিতে $\frac{1}{x+(a+b)}+\frac{1}{x+(c+d)}=\frac{1}{x+(a+c)}+\frac{1}{x+(b+d)}$, এই সমীকরণটির সমাধানে x-এর যে মান পাওয়া যায়, তাতে সমীকরণটি সিদ্ধ হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে সমাধান করলেও যে একই মান হবে, তা বলাই বাহুল্য। বরং শেষোক্ত পদ্ধতিতে জটিলতা আসতে পারে, কিন্তু শূন্য সমুচ্চয়ে পদ্ধতিতে তার শতাংশও নেই। 'উল্টট জিনিস' বেরিয়ে আসার কারণ সম্ভবত গণনার (Computation) জটিলতা।

দ্বিতীয়ত, আগস্ট '83 সংখ্যায় মাত্র দুটি উদাহরণে ভগ্নাংশের হরে ধ্রুবক পদগুলি ঋণাত্মক থাকলেও ধনাত্মক পদবিশিষ্ট সমীকরণ হতে বাধা নেই। যেমন,—

a) $\frac{1}{x+a}+\frac{1}{x+b}=\frac{1}{x+a+c}+\frac{1}{x+b-c}$

b) $\frac{1}{x+a}+\frac{1}{x+b}=\frac{1}{x+a+b}+\frac{1}{x}$

প্রদত্ত সমীকরণ ভেঙেচুরে সমাধান করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে, এবং জটিলতাও আসতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে ওই আগস্ট সংখ্যায় বিশেষ ধরনের সমীকরণ নিয়ে একটি পদ্ধতিতে সমাধানের কথা বলা হয়েছে। শূন্য সমুচ্চয়ে নীতিতে ফেলতে হলে তো শর্ত মানতেই হবে, তাই নয় কি?

তৃতীয়ত, শূন্য সমুচ্চয়ে নীতিতে ফেলার আগে প্রচলিত পদ্ধতিতে সমাধান করলেও সমাধান পাওয়া যায়। তবে কিভাবে করা হবে অর্থাৎ কোন কৌশলে তার উপর জটিলতা নির্ভর করে আছে। আর সে-সবের আলোচনা ওই আগস্ট সংখ্যায় করা সম্ভব ছিল না। বস্তুত তা সঙ্গতিপূর্ণও নয়।

সবার জানা, কোন পাঠ্যপুস্তক বা লেখা শিক্ষকের অভাব পূর্ণ করতে পারে না। শিক্ষার্থীর মনে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক জানা প্রশ্ন আসতে পারে, জটিলতাও আসতে পারে। শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সংযোগ ব্যতিরেকে সে-সবের সদুত্তর পাওয়া কঠিন। আমার লেখাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য গণিতের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করা।

প্রসঙ্গত জানাই আগস্ট সংখ্যার প্রথম অঙ্কটির উত্তর $[8\frac{1}{2}]$ হবে, $[-8\frac{1}{2}]$ নয়।

নন্দলাল মাইতি, ঠাকুরানীচক, হুগলী, 712613

বিজ্ঞান-সংবাদ

দৃষ্টি বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক সেমিনার

Indian Optical Institute & Refraction Hospital-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে কলকাতার কেনেডি হলে 17 ও 18 ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক গ্র্যাজুয়েট ক্লিনিক্যাল সেমিনারে Optometry ও কনট্যাক্ট লেন্স বিষয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনার উদ্বোধন করেন এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ডাঃ আর, কে, পাল ও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের প্রধান ডাঃ রণধীর মুখার্জী। দু' দিনেই আন্তর্জাতিক Optometry ফাউণ্ডেসানের ডিরেক্টর ডাঃ জি, ডি, গিলম্যানের বক্তৃতা সমগ্র সেমিনারটির আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। এছাড়া আধুনিক চক্ষু ও দৃষ্টি চিকিৎসা, কনট্যাকট লেন্স ও অক্যুলার ইমপ্ল্যান্টস-এর প্রয়োগ সম্বন্ধীয় স্লাইড, ভিডিও সহযোগে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডাঃ রণধীর মুখার্জী, ডাঃ জি, ডি, গিলম্যান, ডাঃ আর ব্যানার্জী, ডাঃ এইচ, এম শাহ, ডাঃ এস, আর দাশগুপ্ত, ডাঃ এন, জি, চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট দৃষ্টি-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ। দেশ-বিদেশের প্রায় 150 জন দৃষ্টি এবং চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞগণ সেমিনারে যোগদান করেন।

19 ডিসেম্বর রবীন্দ্রসদনে Institute-এ সুবর্ণ জয়ন্তী ও সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। এই অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের ডাঃ কে কোশলে, আমেরিকার ডাঃ জি, ডি, গিলম্যান, কলকাতার ডাঃ আর ব্যানার্জী প্রমুখ বিশিষ্ট চক্ষু ও দৃষ্টি বিজ্ঞানবিদ্‌গণকে জনকল্যানে তাঁদের বিশেষ অবদানের জন্য Indian optometrical Society-র পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। Institute-এর 30 জন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীকে সার্টিফিকেট অব মেরিট ও সদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 13 জনকে ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ মনীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী।

হিন্দু স্কুল সায়েন্স সেণ্টারের অনুষ্ঠান

2. নভেম্বর '83 হিন্দু স্কুল সায়েন্স সেণ্টারের চতুর্থ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে স্কুলের বিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রদর্শনী, বক্তৃতা ও সিনেমা শো-র আয়োজন করা হয়। Automatic-photo-Switch, Audio-Frequency Oscillator, বৈদ্যুতিক পেণ্ডুলাম ছাড়া 'সোভিয়েত মহাকাশ গবেষণা' এবং 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োগ' বিষয়ক দু'টি ফিল্মও দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞান এবং গণিতে পারদর্শিতার জন্য বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে চারজন ছাত্রকে পুরস্কৃত করা হয় ঐদিন।

বিজ্ঞানের বই

বিজ্ঞান ভারতী (চতুর্থ সংস্করণ) ৩৬·০০

সংকলক ঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

(বিজ্ঞান অভিধান)

আধুনিক কালে বিজ্ঞান অর্থাৎ ভৌতবিজ্ঞান এবং জীবনবিজ্ঞান—এই উভয় শ্রেণীর বিজ্ঞান একটি বিরাট বিষয়। এই বইটি এই সকল বিদ্যার আলোচনায় ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক পারিভাষিক শব্দ ও সংজ্ঞা ইত্যাদিতে পরিপুষ্ট বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যামূলক একটি উৎকৃষ্ট অভিধান। এই গ্রন্থের সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা এবং বিজ্ঞান প্রচারের কাজ খুব সহজ হবে। বিজ্ঞানের সরল বা জটিল সকল প্রকারের মূল কথাগুলি এই গ্রন্থের সাহায্যে অতি সহজেই বোঝা যাবে। বাংলা গ্রন্থজগতে বিজ্ঞান বিষয়ক এই অভিধানটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

জীবনী

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ১৬·০০

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন —কেমন ভাবে কেটেছিল এই মহাজ্ঞানীর ছোটবেলা—কিভাবে ঘটে বিজ্ঞানের সাঙ্গ তার প্রথম পরিচয়—লেখাপড়ায় তেমন পারদর্শী না হয়েও কেমন করে ঘটালেন বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর—কি তাঁর যুগান্তকর তত্ত্ব—এইসব আরও নানা কথা সহজ সরল হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত।

বাষ্পীয়পোত আবিষ্কর্তা রবার্ট ফুলটন ৫·০০

ধ্রুবজ্যোতি সেন

ছোটবেলা থেকেই বালক ফুলটনের ইচ্ছে ছিল একটা কিছু করার। কিশোর বয়সে প্যাডল বোট চালিয়ে, তারপর কিছুদিন শিল্পীজীবন যাপন করে তাঁর ইচ্ছা হয় জগতে কিছু করার। তাঁর প্রচেষ্টায় স্টিমবোট মিসিসিপির জল কেটে এগিয়ে চলল তরতর করে।

অনন্য প্রতিভা রামানুজন ৮·০০

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় ভারতীয় গণিতবিদ্ রামানুজনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবন-গ্রন্থ। অখ্যাতির অন্ধকার থেকে বিশ্ববিখ্যাতির আলোক তোরণে উত্তরণের অনুপম কাহিনী।

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

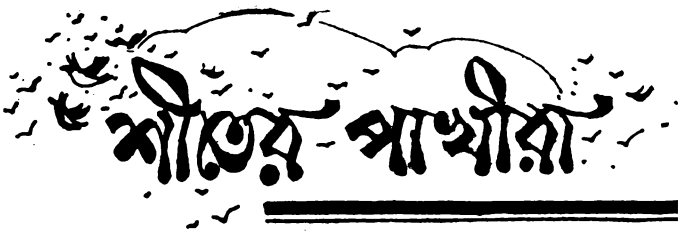

তোমরা যারা ইতিমধ্যেই চিড়িয়খানায় ঘুরে এসেছ, তারা তো নিশ্চয়ই দেখেছ, এবং যারা এর শীত থাকতে থাকতে চিড়িয়াখানায় যাবে, তারা পরেও নিশ্চয়ই দেখতে পাবে, চিড়িয়াখানার জলায় অসংখ্য চেনা-অচেনা পাখীর ভীড়! কোথা থেকে আসে এই সব পাখীরা? কোথায় এদের ঘর বাড়ী? আর শুধু শীতকালেই বা এরা আসে কেন? ভাবতে অবাক লাগে, যখন জানতে পারি এ সব পাখীরা উড়ে আসে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে—পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে।

শীতকালে যখন বরফ পড়তে শুরু করে তখন তারা ঝাঁক বেধে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে চলে আসে অপেক্ষাকৃত যে সব এলাকায় শীত কম সেই সব অঞ্চলে। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, গোটা পৃথিবী জুড়েই চলে তাদের এই পরিক্রমা। উত্তর আমেরিকা ও উত্তর ইওরোপে যখন বরফ গলা শুরু হয় দল বেঁধে এই সব পাখীরা সেখানে বাসা বাধে। আবার যখন শীত পড়তে শুরু করে, বরফ জমতে শুরু করে, তখন আবার তারা দক্ষিণ আমেরিকা বা এশিয়ার কোন দূরবর্তী অঞ্চলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।

শীত পড়লেই ভারতের বুকে উড়ে আসা পাখিদের মধ্যে প্রথমেই নজরে পড়ে কাজল পাখি (ব্রাউন শ্রাইক)। এরা উড়ে আসে এশিয়ার আলতাই পর্বত, সাইবেরিয়া, কামস্ কাটকা। জাপান, চীন ও পূর্ব কোরিয়া থেকে। তারপরই দেখতে পাই নানা জাতের খঞ্জন পাখী। সাদা জাতের খঞ্জন পাখীরাই মেলা আসে। এরা উড়ে আসে প্রধানতঃ আলাস্কা, গ্রীনল্যাণ্ড, উত্তর ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা থেকে। নানা প্রজাতির খঞ্জনদের মধ্যে 2/1টি প্রজাতি আবার ভারতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দেয়, এমন নজীরও রয়েছে। এ সব চেনা-অচেনা পাখীর ভীড়ে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় উড়ে আসে হাঁসের দল ও রকমারি জলচারী পাখী। কেউ কেউ সরাসরি উড়ে আসে হিমালয় পার হয়ে। সারাদিন চিড়িয়াখানা বা কাছে—পিঠের জলায় হৈচৈ করে কাটিয়ে ঠিক সন্ধ্যেবেলায় উড়ে চলে যায়, নিকটবর্তী কোন ধানক্ষেতে। সারারাত ধানক্ষেতে কাটিয়ে ঠিক ভোর হবার আগেই ফিরে আসে জলায়।

গুগ্‌রাল (স্পট্‌বিল ডাক) বালিহাঁস (কমন টিল) নাকটা (কুম্বাডাক) নেকেন্নে (স্নিউ) প্রভৃতি। শরালদের সঙ্গে মিলেমিশে ঘুরে বেড়ায় আরও নানা জাতের হাঁস। তুলসী বিগরি দিগহাঁস, পাতারি হাঁস, (কমনটিল), পীংহাঁস (গাডওয়াল) নীলশির (ম্যালার্ড) প্রভৃতি হাঁস জাতীয় পাখীরা উড়ে আসে সুদূর উত্তর গোলার্ধ, ভূমধ্যসাগরী অঞ্চল, এবং ইউরোপের নানা অঞ্চল থেকে।

পাখীদের এই পরিক্রমন কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়কর। যেমন গোল্ডেন প্লোভার পাখি। এরা প্রধানতঃ বাস করে উত্তর আমেরিকার কানাডায়।

রবীন বল

কানাডায় যখন গভীর শীত নেমে আসে, তখন এরা উড়ে চলে অন্য বাসস্থানের সন্ধানে। অনন্ত সমুদ্রের উপর দিয়ে অবিরাম উড়ে চলে এরা হাজির হয়, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে।

আশ্চর্য! হাজার হাজার মাইল সঠিক ভাবে পথ চিনে, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এরা কি করে আকাশ পথে উড়ে চলে? এরা কখনো দিকভ্রান্ত হয় না—নিজেদের পথ চিনে নিতে একটুও ভুল করে না।

শীতের প্রকোপ এড়িয়ে উপযুক্ত বাসস্থানের উদ্দেশ্যে হাজার মাইল চষে বেড়ায় শিয়ারওয়াটার ও সোয়ালো প্রমুখ পাখিরা! পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়ানো এই সব পাখীরা নাগাড়ে উড়ে চলে 10,000 থেকে 20,000 মাইল পর্যন্ত।

কিন্তু কেন পাখিদের এই পরিযান? এবং কিভাবেই তারা উড়ে চলে হাজির হয় এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে? দিনের বেলা এই সব পাখিরা সাধারণতঃ আহারের সন্ধানেই ব্যস্ত থাকে? পথ পরিক্রমা শুরু করে রাত্রিতে।

বিজ্ঞানীরা এনিয়ে অনেক অনুসন্ধান করেছেন। তাদের ধারণা দিনের বেলা সূর্যের অবস্থান ও রাত্রিতে বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান লক্ষ্য করেই তারা হাজার হাজার মাইল পাড়ি জমায়। পাখীদের অনুভূতি খুবই তীব্র। সূর্য ও নক্ষত্রের অবস্থান থেকেই তারা নিশ্চিত পথ পরিক্রমণ করে সঠিক গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যায়।

বিজ্ঞানীরা আরও অনুমান করেন যে, পাখীদের এই পরিযান প্রধানতঃ বেঁচে থাকার তাগিদে। অনুকূল আবহাওয়া ও খাদ্যের সন্ধানেই শুরু করে তারা এই পরিযান। বেশীর ভাগ পাখিই, ছোট ছোট মাছ, পোকা মাকড় প্রভৃতি খেয়ে জীবন ধারণ করে। শীতকালে যখন চারিদিকে বরফে ঢেকে যায়—তখন খাদ্যের সন্ধানে এরা উড়ে চলে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে—যেখানে এসব খাদ্য পাবার সম্ভাবনা প্রচুর। দ্বিতীয়তঃ প্রতিকূল আবহাওয়াও এই পরিযানের অন্যতম কারণ। শীতের প্রকোপ এড়িয়ে অনুকূল আবহাওয়ার সন্ধানেই পাখিদের এই উড়ে চলা। উত্তর থেকে দক্ষিণে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কোন কোন বিজ্ঞানীর অনুমান, পাখীদের এই পরিযানের পিছনে শারীর বৃত্তীয় কোন উদ্দীপনা কাজ করে। কেউ কেউ মনে করেন—জন্মগত প্রকৃতিই পাখীদের এই পরিযানের অন্যতম কারন। এ সব নিয়ে বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কেন, কিসের সন্ধানে, নিশ্চিত মৃত্যু উপেক্ষা করতে পাখীদের এই অবিরাম উড়ে চলা?

ভবিষ্যতে হয়তো এর সঠিক উত্তর আমরা জানতে পারব।

টাইম সুইচ

[এটি তৈরী করেছেন—সদস্য বৃন্দ, ইলেকট্রনিক্স বিভাগ হিন্দুস্কুল সায়েন্স সেন্টার, কলিকাতা-73]

টাইম সুইচ নতুন কোন আবিষ্কার নয়—বহুকাল ধরে আমরা ঘরে ঘরে-এর ব্যবহার দেখতে পাই, সব থেকে পরিচিত উদাহরণ হলো ঘড়ির এলার্ম (Alarm) ব্যবস্থা, আর একটা উদাহরণ হলো টাইম বোমার সময় নির্ণয়ক যন্ত্র।

যাইহোক এখানে আলোচিত টাইম-সুইচটা কিন্তু ওপরের ঐ ঘড়ি জাতীয়—যন্ত্রগুলোর থেকে আলাদা কারণ ঐ সমস্ত ঘড়ি জাতীয়—টাইম সুইচ গীয়ার (Gear), স্প্রিং (spring) প্রভৃতি ধাতব যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরী আর এই টাইম সুইচটা তৈরী ইলেকট্রনিকস প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে এই ধরণের যন্ত্রে ট্রানজিস্টার (Transistor), ট্রায়াক (Triac) প্রভৃতি অর্ধপরিবাহী যন্ত্রাংশ (Semicondist-Devices) ব্যবহার করা হয়। এইরকম-ই ইলেকট্রনিক-টাইম সুইচকে ইঞ্জিনিয়ারদের ভাষায় বলা হয় "সলিড—স্টেট টাইম-সুইচ" (Solid-State time-Switch)। এই "Solid State"-টাইম-সুইচের-ঘড়ি জাতীয় যান্ত্রিক—ব্যবস্থার তুলনায়—সুবিধে অনেক, যেমন

(1) ইলেকট্রনিক—ব্যবস্থাতে খুব নিখুঁত সময় মাপা যায়—

(2) ইলেকট্রনিক টাইম সুইচ চালাবার সময় কোন শব্দ করে না।

(3) এই যন্ত্র ওজনে খুব হাল্কা এবং খুবই দীর্ঘস্থায়ী হয়—ইত্যাদি।

এবার একটা Circuit Diagram-এর সাহায্যে এই যন্ত্র কি ভাবে কাজ করে দেখা যাক।

বর্ণনা ঃ—এই ইলেকট্রনিক্ টাইম সুইচে একটা—ট্রানজিস্টারই (ছবিতে—T) হলো প্রধান উপাদান। এই সারকিটে (circuit) আসলে—সময় নির্ণয় করছে Resistor এবং Capacitor-এর Network (ছবিতে R. and C.)। অন্যসমস্ত আনুষঙ্গিক—উপকরণের মধ্যে প্রথম হলো Thyristor পরিবারের অন্তর্গত একটা অর্ধ পরিবাহী (Semiconductor যন্ত্র,—ট্রায়াক (Triac)। পুরো Circuit-এর কার্যপদ্ধতি বুঝতে হলে Transistor, Triac প্রভৃতির সম্পর্কে একটু জানতে হবে ঃ

এই Circuit-এ ট্রানজিস্টার একটা Low-Voltage-switch এর কাজ করছে। ট্রানজিস্টারের ধর্ম হলো যে এর Emitter-প্রান্তের সাপেক্ষে Base প্রান্তের Voltage যদি Silicon P. N. P-ট্রানজিস্টারের বেলায় 0·6 Volt-এর সমান বা একটু বেশী হয় তবেই Transistor—Switch-টা অন্ (on) হবে। ঐ শর্ত না মানলে এই Transistor Switch (off) অফ্ থাকবে।

এবার আসা যাক Triac-এর কথায়, অনেকটা ট্রানজিস্টারের মতো এরও তিনটে প্রান্ত (Lead) থাকে এই প্রান্তগুলোর নাম হলো—

MT_1, MT_2 এবং Gate এই Circuit এ ট্রায়াকের কাজ হলো High Voltage Switch এর মতো ব্যবহার করা। এটার সাহায্যে 230 Volt A. C লোড্ (Load) যেমন আলো, পাখা ইত্যাদি চালানো বা বন্ধ করা যায়। ট্রায়াকের ধর্ম অনেকটা ট্রানজিস্টারের মতন। MT_1 প্রান্তের সাপেক্ষে Gate প্রান্তের Voltage যদি 2 Volt-এর বেশী হয়—এবং প্রায় 30 থেকে 50 mili-amplere Current এই Gate প্রান্তে সরবরাহ করা হয় তবেই ঐ Triac—Switch-টা অন্ (on) হবে নতুবা Triac Switch Off থাকে। এখানে বলা ভাল যে ওপরের এই সমস্ত ধর্ম কেবলমাত্র A. C.-supply (230 Volt) এর ক্ষেত্রে খাটবে। D. C. circuit-এ একবার Triac Switch—Gate এর সাহায্যে On-করলে তারপর Gate এর আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না ফলে ঐ Triac আর off হবে না। এই ঘটনাকে বলা হয়—Latching।

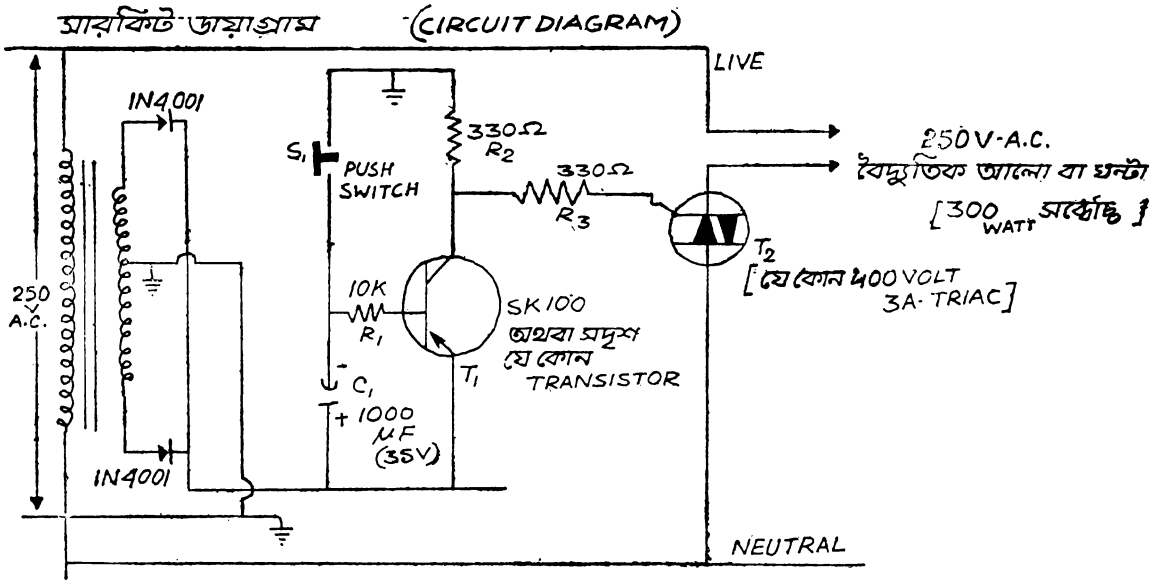

কার্যপদ্ধতি ঃ ছবিতে দেখলেই বোঝা যাবে যে ঐ Push-Button Switch (s)—টিপলেই C_1 Capacitor টা খুব তাড়াতাড়ি charged হয়ে ওঠে ফলে ঐ capacitor এর ঋণাত্মক প্রান্ত প্রায় 9 volt বিভব লাভ করে, এইবার S_1-off করলে 9 Volt-বিভব প্রভেদ (T_1) Transistor এর Emitter এবং Base-এর দুইপ্রান্তে দেখা দেয়। এই কারণে Transistor টা বিদ্যুৎ বহন করতে আরম্ভ করে। এবার Transistor conduct করতে শুরু করলে Triac (T_2) এর-gate ঐ Transistor এর Collector এবং Emitter এর মাধ্যমে + 9v—এর Supply line এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, ফলে—Triac টাও বিদ্যুৎ পরিবহন করতে শুরু করে এবং 230 volt A. C. চালিত কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রকে চালু করে। সাধারণ অবস্থায় যখন Transistor টা off থাকে তখন Triac এর gate 330 মান সম্পন্ন R_2 এর R_3 এই দুই রোধের মাধ্যমে O শূণ্য বা Earth-Potential এর সঙ্গে যুক্ত থাকে অর্থাৎ Triac টা Non Conductive থাকে।

Transistor টা কতক্ষণ বিদ্যুৎ পরিবাহী হবে সেটা নির্ভর করে R_1 and C_1 এই দুটোর মানের ওপর, C_1 Capacitor একবার Charged হয়ে গেলে তারপর তা আস্তে আস্তে R_1 এবং Transistor এর Bane এবং Emitter এর মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে Discharged হতে থাকে ফলে Capacitor এর দুই প্রান্তর বিভবপ্রভেদ 9 volt থেকে কমতে কমতে—যেই 0·6 volt এর থেকে কমে যায় তেমনি Transistor switch টা off হয়ে যায় এবং Triac Switch off হয়।

এই Circuit টা যে কোন-11 Pin সম্পন্ন Printed Circuit Board (P C B)-এ তৈরী করা যায়। আমাদের বিজ্ঞান কেন্দ্রে এই যন্ত্র তৈরী হয়েছে একটা Yero-Board এর ওপর। এই টাইম সুইচের সব যন্ত্রাংশ চাঁদনী বাজার (কলিকাতা) এলাকায় যে কোন নামী দোকানে পাওয়া যাবে।

সাবধানতা ঃ যেহেতু High-voltage (230 V. A. C) এবং Low Vlltage (9 V. D. C) এই দুই Circuit সরাসরি যুক্ত সুতরাং, এই যন্ত্র যখন চালু থাকবে তখন এর কোন অংশ স্পর্শ করলে বৈদ্যুতিক শক্ লাগার আশঙ্কা আছে।

ভেবে ভেবে বল—উত্তর ঃ

1. প্লানেটেরিয়াম 2. ম্যাগেলানিক ক্লাউড 3. চীনেরা মঙ্গলদের বিরুদ্ধে, 4. SPHEROMETER 5. 6 লক্ষ মাইল 6. ডাক্তারদের 'সূচ' (DOCTORS NEEDLE) 7. ক্যালিফোরনিয়ার মাউণ্ড পালোমারে 8. ELECTROCARD-DIO GRAN 9. আইনস্টাইন 10. CEREBELLUM 11. মশা।

104. ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-700 008

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

নবম কলিকাতা পুস্তক মেলায় তোমাদের প্রিয় বিজ্ঞান-লেখকদের আরও কয়েকটি সচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সংগে সম্প্রতি প্রকাশিত বইগুলি তো পাবেই, এবং কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুরানো মাসিক ও বার্ষিক সংখ্যাগুলিও দেখতে ও কিনতে পারবে।

অজয় হোম	বিচিত্র জীবজন্তু	১৮.০০
এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়	বিচিত্র বিজ্ঞান	১০.০০
বিমান বসু	গ্রহ পরিচয়	১০.০০
সিদ্ধার্থ ঘোষ	অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক	১০.০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য	রোবোট এল কেমন করে?	৬.০০
সমরজিৎ কর	সমুদ্রের সম্পদ	৮.০০
অমরনাথ রায়	নলেজ কুইজ	১০.০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য	যুক্তি তর্ক হেঁয়ালি	১০.০০
সমরজিৎ কর	নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী	১৫.০০
পার্থসারথি চক্রবর্তী	মাটি থেকে আকাশে	১০.০০
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	পশু পাখী কীট পতঙ্গ	৮.০০
অমরনাথ রায়	সংখ্যা নিয়ে খেলা	৫.০০
সিদ্ধার্থ ঘোষ	লুইস ক্যারোলের ধাঁধা	১০.০০
অমরনাথ রায়	জ্ঞান-বিজ্ঞানেব মজার খেলা	৫.০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	পশুপক্ষী	২০.০০
অমরনাথ রায়	সায়েন্স কুইজ	১০.০০
অজয় হোম	বাংলার পাখি	২০.০০
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার	৬.০০

॥ বই মেলায় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্টলে যোগাযোগ কর ॥

৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

শীতের আকাশ

বিমান বসু

শীতের মেঘহীন আকাশে যে তারামণ্ডলটি সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তার নাম কালপুরুষ বা ওরায়ন (orion)। বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল তারা নিয়ে তৈরী তারামণ্ডলটিতে যোদ্ধার বেশে একটি মানুষের আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে। মানুষটির এক হাতে আছে ঢাল, অপর হাতে মুগুর। তার কটিবন্ধে ঝুলছে খাপে ঢাকা তরওয়াল।

কালপুরুষ তারামণ্ডলের সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল তারাটির নাম বাণরাজা বা রাইজেল (Rigel)। নীলচে আভার সাদা রং এর এই তারাটি রয়েছে কালপুরুষের বাঁ পায়ে। তারা হিসেবে বাণরাজার বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। তারাটির ব্যাস সূর্যের প্রায় 33 গুণ আর ঔজ্জ্বল্য সূর্যের তুলনায় প্রায় 55,000 গুণ। পৃথিবী থেকে বাণরাজার দূরত্ব প্রায় 1200 আলোক বর্ষ।

কালপুরুষ তারা মণ্ডলের আর একটি উজ্জ্বল তারা আর্দ্রা বা বিটেল্‌জুস্‌ (Betelgeuse)। এটিকে দেখতে পাবে কালপুরুষের ডান কাঁধে। লালচে হলদে রং এর তারাটি বিশাল। এর ব্যাস সূর্যের প্রায় 450 গুণ, কিন্তু এ ব্যাস সব সময় এক থাকে না, যথেষ্ট কমে বাড়ে। সেজন্য আর্দ্রার ঔজ্জ্বল্যেও যথেষ্ট কম বেশী হয়। যখন সব চেয়ে বেশী উজ্জ্বল সে সময় আর্দ্রার প্রভা 0·3, কিন্তু সময় সময় এর প্রভা কমে দাঁড়ায় 1·1। পৃথিবী থেকে আর্দ্রার দূরত্ব 520 আলোক বর্ষ। কালপুরুষের বাঁ কাঁধের তারাটির নাম বেলাট্রিক্স্‌ (Bellatrix)।

কালপুরুষের কটিবন্ধের তিনটি তারাকে দেখা যায় একই সরলরেখায়। এদের মধ্যে 'ঘ' তারাটি রয়েছে খ-বিষুবের ঠিক ওপরে। তাই আকাশে এটির চলন ঠিক পুব থেকে পশ্চিমে। এটি উদয় হয় ঠিক পুবে, অস্ত যায় ঠিক পশ্চিমে। এখানে একটা কথা বলে রাখি। কালপুরুষ যখন সবে উদয় হচ্ছে (কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি রাত 10টা নাগাদ) তখন তাকে চেনবার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ঐ তিনটি তারাকে চিনে নেওয়া।

কালপুরুষের কটিবন্ধের নীচে, যেখানে খাপে ঢাকা তরওয়ালের কল্পনা করা হয়েছে, সেখানে দেখতে পাবে অস্পষ্ট আলোর একটা ছোপ। ওটা আসলে একটি নীহারিকা, নাম ওরায়ন্‌ নেব্যুলা (Orion nebula) বা 'এম-42'। দূরবীনে নীহারিকাটির হালকা সবুজ রং এর গ্যাসীয় রূপ চোখে পড়ে। মহাকাশে এম-42-এর মত গ্যাসীয় পিণ্ডের ভেতরেই তারাদের জন্ম হয়।

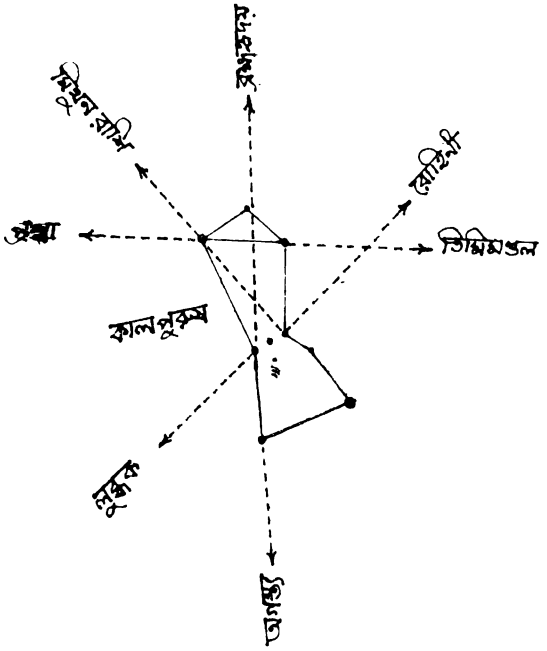

কালপুরুষে দুটি চান্দ্র নক্ষত্র আছে। তারামণ্ডলের 'ট'-তারাটি (যেটি কালপুরুষের মাথা) হলো মৃগশীর্ষ নক্ষত্র। অন্যটি আর্দ্রা যার বিষয় আগে বলেছি।

কালপুরুষ মধ্যগমন করে 1লা মাঘ রাত 10টায় এবং 1লা কার্তিক ভোর 4টে নাগাদ। পৌষ মাঘ মাসে তারা মণ্ডলটিকে প্রায় সারা রাত ধরেই আকাশে দেখতে পাবে।

কালপুরুষকে ভালভাবে চিনে রাখলে একে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি তারামণ্ডলকে সহজেই খুঁজে নিতে পারবে, যেমন 3নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

কালপুরুষের উত্তর পশ্চিমে রয়েছে রাশিচক্রের তারামণ্ডল বৃষ বা টরাস্‌ (Taurus) এর সব চেয়ে উজ্জ্বল তারা রোহিনীকে দেখতে পাবে কালপুরুষের বাঁ হাতে ধরা ঢালের ঠিক ওপরে। রোহিণীর বিদেশী নাম অ্যালডেবারান্‌ (Aldebaran)। রোহিণীকে দেখতে প্রায় আর্দ্রার মতই, লালচে হলদে রং এর, তবে এর ঔজ্জ্বল্য আর্দ্রার তুলনায় কম। রোহিণী ছাড়া বৃষরাশিতে আর একটি উজ্জ্বল তারা আছে, নাম 'এল্‌ নাথ' (El-Nath)।

বৃষরাশির সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিষ দুটি তারাপুঞ্জ। আকাশ পরিষ্কার থাকলে রোহিণীর আশেপাশে গোটাদশেক ছোট ছোট তারা চোখে পড়বে। তারা পুঞ্জটির বিদেশী নাম হায়াডিজ্ (Hyades)। ভারতীয় মতে এটিকে রোহিনী চান্দ্র নক্ষত্রের অন্তর্ভুক্ত বলেই ধরা হয়। রোহিনীকে নিয়ে হায়াডিজ তারাপুঞ্জটিকে দেখায় অনেকটা ইংরেজি অক্ষর 'v' এর মত।

এখানে একটা কথা মনে রেখ। পৃথিবী থেকে রোহিণীকে হায়াডিজ তারাপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত মনে হলেও আসলে কিন্তু তা নয়। পৃথিবী থেকে হায়াডিজ-এর দূরত্ব প্রায় 130 আলোক বর্ষ। সে তুলনায় রোহিণীর দূরত্ব মাত্র 68 আলোক বর্ষ। মহাকাশে একই দৃষ্টি পথে রয়েছে বলেই অমন মনে হয়।

বৃষরাশির দ্বিতীয় তারাপুঞ্জটিকে দেখতে আরও সুন্দর নাম কৃত্তিকা বা প্লিয়াডিজ (Pleiades)। একে দেখতে পাবে মেষরাশির ঠিক পূবে। কৃত্তিকা পুঞ্জের সাতটি তারাকে অনায়াসে শুধু চোখে দেখা যায়। সে জন্য একে 'সাত ভাই চম্পা'ও বলা হয়। আকাশ খুব পরিষ্কার থাকলে দশটা তারা চোখে পড়তে পারে, তার বেশী নয়। দূরবীনে অবশ্য একশ'রও বেশী তারা দেখা যায়। তারাপুঞ্জের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটির-নাম এ্যালসাইওন (Alcyone)। এটি বৃষরাশির 'ছ'-তারা। পৃথিবী থেকে কৃত্তিকা তারাপুঞ্জের দূরত্ব প্রায় 500 আলোক বর্ষ। মনে রেখ, রোহিণী ও কৃত্তিকা দুইই চান্দ্র-নক্ষত্র।

কৃত্তিকা মধ্যগমন করে 15ই পৌষ রাত 9টায় এবং 15ই কার্ত্তিক ভোর 3টে নাগাদ। রোহিণী মধ্যগমন করে মাঘ মাসের মাঝামাঝি রাত 8টায় এবং আশ্বিনের মাঝামাঝি ভোর 4টে নাগাদ।

বৃষরাশির ঠিক উত্তরে রয়েছে প্রজাপতি বা অরাইগা (Auriga) তারামণ্ডল। এতে বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল তারা রয়েছে বলে সহজেই চেনা যায়। পাঁচটি উজ্জ্বল

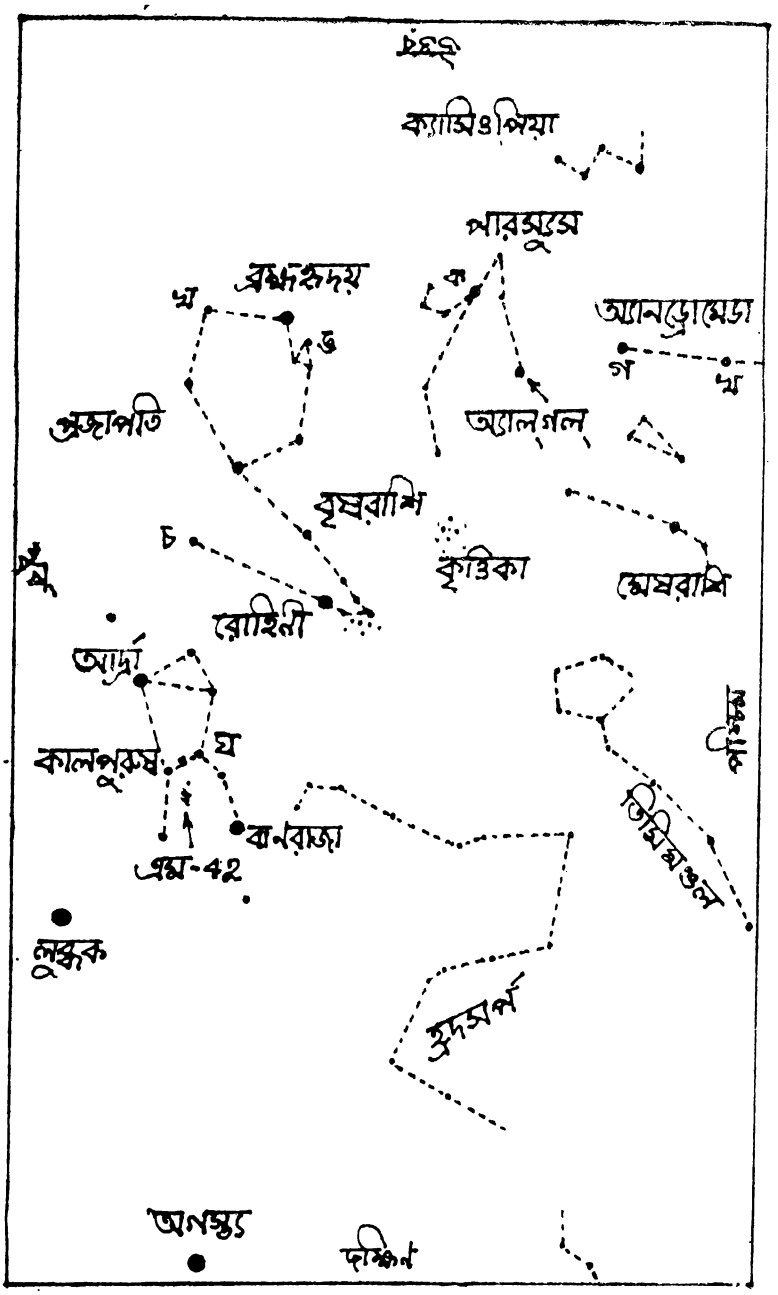

শীতের আকাশের তারামণ্ডল

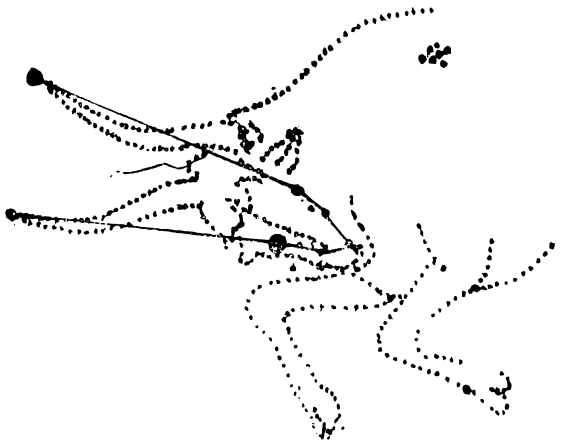

বৃষরাশি

তারা নিয়ে তৈরী এর বিশাল পঞ্চভুজটিকে দেখতে পাবে বৃষের ঠিক মাথার ওপর। পঞ্চভুজের দক্ষিণ প্রান্তের তারাটি অবশ্য বৃষরাশিরই অন্তর্ভুক্ত। প্রজাপতি তারামণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটির নাম ব্রহ্মহৃদয় বা ক্যাপেল (Capella)। হালকা হলদে রং-এর তারাটির প্রভা 0.2। ব্রহ্মহৃদয় মধ্যগমন করে 15ই মাঘ রাত 9টা নাগাদ এবং 15ই কার্ত্তিক ভোর 3টে নাগাদ।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে ব্রহ্মহৃদয়ের ঠিক দক্ষিণে ত্রিভুজের আকারে তিনটি ছোট তারা দেখতে পাবে। এদের মধ্যে ঙ-তারাটি আসলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু। চতুর্থ প্রভার এই তারাটি আসলে একটি যুগল তারা কিন্তু এর সঙ্গী তারাটিকে দেখা যায় না কারণ সেটি আলো বিকীরণ করে না। জ্যোতি-বিজ্ঞানীরা তারাটি থেকে বেরিয়ে আসা অবলোহিত রশ্মি বা infrared rays অধ্যয়ন করেই এর বিষয় জানতে পেরেছেন। তাঁদের মতে অদৃশ্য ঐ তারাটি সম্ভবতঃ মহাকাশের সবচেয়ে বড় তারা। এর ব্যাস প্রায় 300 কোটি কিলোমিটার মানে আমাদের সূর্যের ব্যাসের 2100 গুণ! অতিকায় ঐ অদৃশ্য তারাটি রয়েছে পৃথিবী থেকে 3400 আলোক-বর্ষ দূরে।

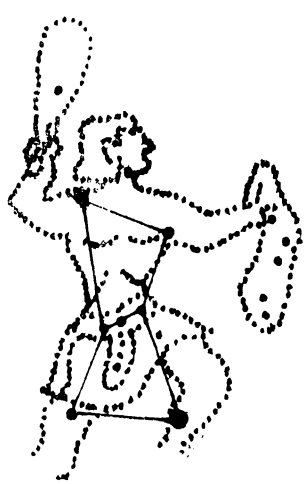

কালপুরুষ

উত্তর আকাশে প্রজাপতি ও অ্যানড্রোমেডার মাঝখানে রয়েছে পারস্যুস্ (Perseus) তারামণ্ডল। এ তারামণ্ডলটিতে মাত্র একটি উজ্জ্বল (দ্বিতীয় প্রভার) তারা আছে (ছবিতে ক-তারা), বাকি সবই তৃতীয় বা চতুর্থ প্রভার তারা। ক-তারাটিকে খুঁজে পেতে হলে অ্যানড্রোমেডার খ-ও গ-তারা দুটিকে যোগ করে সেই রেখাটিকে পূর্বদিক বরাবর বাড়িয়ে দাও তাহলেই হবে। অবশ্য আকাশ পরিষ্কার থাকলে ব্রহ্মহৃদয়ের পশ্চিমে এ তারাটিকে চিনতে খুব অসুবিধে হবে না।

পারস্যুস তারামণ্ডলের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ অ্যাল্‌গল্ (Algol) নামক তারাটি। অ্যালগলের বৈশিষ্ট্য এর ঔজ্জ্বল্য নিয়মিত বাড়ে কমে। যদি পর পর কয়েক রাত ধরে তারাটিকে লক্ষ করো তাহলে দেখবে প্রতি আড়াই দিন (59 ঘণ্টা) বাদে এর ঔজ্জ্বল্য কমতে শুরু করে। এর প্রভা 2·2 থেকে কমতে কমতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে হয়ে দাঁড়ায় 3·5। তারপর পরবর্তী পাঁচ ঘণ্টা ধরে আবার তা বাড়তে থাকে এবং আগেকার ঔজ্জ্বল্যে ফিরে আসে। তারপর আড়াই দিন একই থাকে। এমনটা হয় কারণ অ্যাল্‌গল্ আসলে একটি যুগ্ম তারা—এর সঙ্গে আরও একটি তারা আছে যার প্রভা অনেক কম। দুটো একে অপরকে পাক খেয়ে ঘুরছে বলে প্রতি 59 ঘণ্টা অন্তর কম প্রভার তারাটি পৃথিবী আর উজ্জ্বল তারাটির মাঝে এসে পড়ছে, অনেকটা যেমন হয় পৃথিবীতে সূর্যগ্রহণের সময়। এর ফলেই উজ্জ্বল তারাটি কয়েক ঘণ্টার জন্যে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

উত্তর আকাশ থেকে এবারে কালপুরুষের দক্ষিণের কয়েকটি তারামণ্ডলের দিকে নজর দেওয়া যাক্। কালপুরুষ যখন মধ্যগমন করছে, মানে যখন সে আকাশে সবচেয়ে উঁচুতে রয়েছে, তখন দক্ষিণ দিগন্তের একটু ওপরেই খুব উজ্জ্বল একটা তারা দেখতে পাবে। ওটা হলো অগস্ত্য বা ক্যানোপাস্ (Canopus)। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাগুলির মধ্যে এটি দ্বিতীয় (প্রভা—0·7) দক্ষিণ আকাশের তারা বলে অগস্ত্যকে ভারতের উত্তরাংশ থেকে দিগন্তের ওপরে খুব অল্প সময়ের জন্যেই দেখা যায়। দক্ষিণ দিগন্তের সবচেয়ে ওপরে একে দেখতে পাবে মাঘ মাসের মাঝামাঝি রাত 10টা নাগাদ, আবার কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি ভোর 4টের সময়।

আকাশের সর্বোজ্জ্বল তারাটির নাম লুব্ধক বা সিরিয়াস্ (Sirius), প্রভা—1·4। এটি রয়েছে ক্যানিস মেজর (Canis Major) তারামণ্ডলে। একে দেখতে পাবে কালপুরুষের দক্ষিণ পূবে। লুব্ধক মধ্যগমন করে 1লা ফাল্গুন রাত 9টায় এবং 1লা অগ্রহায়ণ ভোর 3টে নাগাদ।

(ক্রমশঃ)

7/UF কলেজ রোড, নয়াদিল্লী-1

পড়াশোনা

পদার্থবিদ্যা

অলক চক্রবর্তী

[গত সংখ্যার অবশিষ্ট অংশ]

প্রশ্ন 18ঃ চলন্ত গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নামবার সময় গাড়ীর গতির উল্টোদিকে মুখ করে নামা বিপজ্জনক কেন ?

উত্তর 18ঃ চলন্ত গাড়ীতে থাকবার সময় দেহে গতিজাড্যের সৃষ্টি হয়। ফলে দেহ সব সময় গাড়ীর গতির দিকে নিজের গতি বজায় রাখবার চেষ্টা করে। মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দেহের নীচের অংশ স্থির হয়ে যায়, কিন্তু দেহের ওপরের অংশ গতিজড়তার জন্যে গাড়ীর গতির দিকে গতিশীল থাকতে চেষ্টা করে। তাই দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, কিন্তু গাড়ীর গতির উল্টোদিকে মুখ করে নামলে দেহ পেছনের দিকে একই কারণে হেলে পড়ে বলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাব, কারণ ঐ অবস্থায় দেহের পেছন দিকের গতি সামলানো সম্ভব হয় না। তাই চলন্ত গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নামবার সময়ে গাড়ীর গতির উল্টোদিকে মুখ করে নামা বিপজ্জনক।

প্রশ্ন 19ঃ একই দিকে সমান বেগে চলছে পাশা-পাশি দুটো ট্রেনের দুজন যাত্রী পরস্পর স্থির—এই কথা বলার যুক্তি কি ?

উত্তর 19ঃ ট্রেন দুটো একই দিকে সমান বেগে পাশাপাশি চলতে থাকে বলে ট্রেনের দুজন যাত্রী পরস্পর স্থির এ কথা বলা হয়।

প্রশ্ন 20 ঃ একটা a মিটার ব্যাসার্ধের গোলাকার পথের কোন বিন্দু থেকে পরিধি বরাবর এবং সোজা ব্যাস বরাবর হেঁটে উল্টোদিকের ওপরের বিন্দুতে পৌঁছলে কোন্ ক্ষেত্রে সরণ কত হবে ? অতিক্রান্ত পথ দুটোর ক্ষেত্রে কত হবে ?

উত্তর 20ঃ দুটো ক্ষেত্রে সরণ হবে 2a মিটার। অতিক্রান্ত দূরত্ব প্রথম ক্ষেত্রে হবে 2π a মিটার ($\pi = \frac{22}{7}$) এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 2a মিটার।

প্রশ্ন 21ঃ গোল মাঠে সাইকেল রেস হচ্ছে ; সোজা রেললাইন ধরে ট্রেন চলছে। কোন্ ক্ষেত্রে 'দ্রুতি', কোন্ ক্ষেত্রে 'বেগ' কথাটা ব্যবহার করা ঠিক হবে বল।

উত্তর 21ঃ সোজা রেললাইন দিয়ে চলমান ট্রেনের দিক পাল্টায় না বলে সেক্ষেত্রে 'বেগ' কথাটা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু গোল মাঠে গতিশীল সাইকেল প্রতি মুহূর্তে ওর গতির দিক পালটায় বলে সেক্ষেত্রে বেগ ব্যবহার করা যাবে না, দ্রুতি ব্যবহার করাই ঠিক হবে।

প্রশ্ন 22ঃ স্থিতি ও গতি আপেক্ষিক কেন ?

উত্তর 22ঃ চলন্ত গাড়ীতে কোন লোক তার পাশের লোককে বা গাড়ীতে রাখা অন্য মালপত্রকে স্থির দেখে। কিন্তু গাড়ীর বাইরে স্থির কোন লোক ঐ গাড়ীর লোককে বা ভেতরে রাখা মালপত্রকে গতিশীল দেখবে। আবার চলন্ত গাড়ীর ভেতরে বসা লোকটার কাছেও ঐ স্থির লোক বা গাড়ীর বাইরের স্থির গাছপালা, ঘর বাড়ী গতি শীল মনে হবে। প্রকৃতপক্ষে যা একটা লোক সাপেক্ষে স্থির তা অন্যের সাপেক্ষে গতিশীল হতেই পারে। কাজেই দেখা যায়, স্থিতি ও গতি আপেক্ষিক।

প্রশ্ন 23 ঃ একটা মাল বোঝাই লরি ও একই রকম একটা লরি একই বেগে চললে কোন্‌টাকে সহজে থামানো যাবে ?

উত্তর 23ঃ খালি লরিটার ভরবেগ মাল বোঝাই লরিটার থেকে কম বলেই ওটা থামানো সোজা।

প্রশ্ন 24ঃ একটা চলন্ত ট্রেনের মধ্যে একটা বল ছুঁড়ে দিলে ওটা আবার হাতে আসে কেন ঃ

উত্তর 24ঃ ওপরে ছোঁড়ার সময় বলের গতিবেগ ট্রেনের বেগের সমান ছিল। ওপরে ছোঁড়বার জন্যে ওর আর একটা বেগ সৃষ্টি হল। এই বেগ ও আগের সামনের দিকের বেগের জন্যে বলটা সামনের দিকে কিছুটা দূর গিয়ে তারপর নীচে পড়বে। এই সময়ে আবার ট্রেনের লোকও কিছু দূর এগিয়ে যায়। ফলে বলটা আবার তার হাতেই পড়বে।

প্রশ্ন 25ঃ কোন বস্তু সমদ্রুতিসম্পন্ন হলেও সমান বেগের নাও হতে পারে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর 25ঃ যদি কোন বস্তু আঁকাবাঁকা পথে এমন-ভাবে চলতে থাকে যে নির্দিষ্ট সময়ে তার দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব সব সময় সমান থাকে, তবে তা সমান দ্রুতির হবে। কিন্তু যেহেতু ওর গতির দিক পালটাচ্ছে, তাই ওটা সমান বেগের হবে না।

প্রশ্ন 26ঃ স্থির কোন বাস হঠাৎ চলতে শুরু করলে বাসের লোকেরা পেছন দিকে হেলে পড়ে কেন ?

উত্তর 26ঃ স্থির বাসের লোকেরা স্থির বলে তাদের মধ্যে স্থিতি জড়তার সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাসটা হঠাৎ চলতে শুরু করলে লোকেদের বাসের মধ্যে থাকা দেহের নীচের দিক তখনই বাসের গতি পেয়ে যায়, অথচ

ওপরের দিক স্থিতিজড়তার জন্যে আগের জায়গাতেই থাকতে চায় বলে লোকেরা হেলে পড়ে।

প্রশ্ন 27ঃ চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে সামনে কিছুদূর ছুটে যেতে হয় কেন?

উত্তর 27ঃ চলন্ত ট্রামে থাকার সময়ে আমাদের দেহ ট্রামের গতিতে থাকে। ট্রাম থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে দেহের নীচের দিক স্থির হয়ে যায়, কিন্তু ওপরের অংশ গতিজড়তার জন্যে আগের গতি বজায় রাখতে চেষ্টা করে। সুতরাং, দেহ কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাই যদি সামনের দিকে কিছুটা ছুটে যাওয়া যায়, তবে দেহের নীচের অংশও কিছুক্ষণের জন্য গতিশীল থাকে, এর মধ্যে দেহের ওপরের অংশও ঐ গতিজড়তার থেকে মুক্ত হয় এবং সমস্ত দেহ তারপর স্থির অবস্থায় আসতে পারে।

প্রশ্ন 28ঃ লং জাম্প দেবার সময় দূর থেকে ছুটে আসা সুবিধেজনক কেন?

উত্তর 28ঃ লং জাম্প দেবার সময় খানিকটা দূর থেকে ছুটে আসলে গতিজড়তার সৃষ্টি হয় বলে ওর জন্যে অনেক দূর লাফানো সহজ হয়।

প্রশ্ন 29ঃ বাতাসের বাধা বা পৃথিবীর আকর্ষণ কিছুই নেই এরকম জায়গায় কোন সচল বস্তু কি রকম আচরণ করবে?

উত্তর 29ঃ নিউটনের প্রথম গতিসূত্র অনুযায়ী ঐ সচল বস্তু সমানবেগে সরলরেখা বরাবর চিরকাল চলতে থাকবে।

প্রশ্ন 30ঃ মাটি থেকে কোন বস্তুর অবস্থান যত ওপরে হয়, নীচে পড়ে ওটা তত জোরে মাটিকে আঘাত করে কেন?

উত্তর 30ঃ উঁচু থেকে বাধা ছাড়া নীচে পতনশীল বস্তুর ওপর অভিকর্ষজ কাজ করে বলে বস্তুর প্রথম অবস্থান মাটি থেকে যত বেশী ওপরে হয় মাটিতে পড়ার সময়ে মাটি ছোঁয়ার আগে ওর গতিবেগ তত বেশী হয়। কাজেই ভর আলাদা হলেও বস্তুটা যত ওপর থেকে মাটিতে পড়ে ওর ভরবেগ মাটি স্পর্শ করলে তত বেশী হয়। এই জন্যেই তখন ওটা বেশী জোরে মাটিকে আঘাত করে।

প্রশ্ন 31ঃ খুব টান করা রবারের সুতোর মাথায় একটা ভারী খেলনাগাড়ী ও অন্য মাথায় একটা হালকা খেলনাগাড়ী আটকে গাড়ী দুটোকে ছেড়ে দিলে সুতোটার টানে একটা গাড়ী অন্যটার দিকে ছোটে। ঐ অবস্থায় ভারী গাড়ীটা আস্তে ও হালকা গাড়ীটা জোরে ছোটে কেন?

উত্তর 31ঃ টান করা রবারের সুতোটা দুটো গাড়ীকেই সমান বলে টানে। ভারী গাড়ীটার ভর বেশী বলে, ওর ত্বরণ অন্যটার চেয়ে কম হয়; ফলে একই সময়ে ওর বেগ অন্যটার চেয়ে কম হয়। সেই জন্যে ওটা অন্যটার চেয়ে আস্তে ছোটে।

প্রশ্ন 32ঃ চলন্ত বস্তুকে কি করে থামানো যায়?

উত্তর 32ঃ ওর গতির উল্টোদিকে বল দিলে চলন্ত বস্তু থেমে যায়।

প্রশ্ন 33ঃ কোনো বস্তুর ওপর একটা মাত্র বল কাজ করলে কি হয়?

উত্তর 33ঃ বস্তুটা সমত্বরণে চলে।

প্রশ্ন 34ঃ সমান ত্বরণে পতনশীল ঢিলের গতি-প্রকৃতি কি রকম হবে, সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর 34ঃ ঢিলের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে নির্দিষ্ট পরিমাণে বাড়তে থাকে। সমান ত্বরণ g কাজ করলে t সময় পর ঢিলটার গতিবেগ হবে gt (স্থির অবস্থা থেকে ওকে ছেড়ে দিলে)।

প্রশ্ন 35ঃ গরম কোট ঝাড়লে ধুলোবালি পড়ে যায় কেন?

35ঃ ঝাড়বার সময়ে গতিশীল কোটের সুতোর ফাঁকে ফাঁকে আটকানো ধুলোবালি তাদের স্থিতিজড়তার জন্যে স্থির থাকতে চায় বলে পড়ে যায়।

প্রশ্ন 36ঃ উঁচু দিকে ছোঁড়া ঢিল কিছুটা উঠে আর ওঠে না কেন?

উত্তর 36ঃ উঁচু দিকে ছোঁড়া ঢিলের ওপর মন্দন কাজ করে (যার সংখ্যায় মান অভিকর্ষজ ত্বরণের সমান) বলে কোনো প্রাথমিক বেগে ছোঁড়া ঢিলটার গতিবেগ ঐ মন্দনের জন্যে এক সময় শূন্য হবে এবং তখন অভিকর্ষজ ত্বরণের জন্যে ওটা নীচের দিকে পড়তে থাকবে।

প্রশ্ন 37ঃ সমত্বরণ কাকে বলে? এর একটা খুব পরিচিত উদাহরণ দাও।

উত্তর 37ঃ ত্বরণের জন্যে বেগ যদি একই হারে বাড়তে থাকে তবে ওর ত্বরণকে সমত্বরণ বলে।

কোন বস্তু বিনা বাধায় পড়তে থাকলে ওটা সমত্বরণ নিয়ে নীচে পড়ে; ওর ওপর সমত্বরণ অভিকর্ষজ g (অভিকর্ষজ ত্বরণ) কাজ করে।

প্রশ্ন 38ঃ ময়লা কম্বল বা ময়লা কার্পেট একটু উচুঁতে তুলে পেটালে ধুলো সহজে বের হয়ে যায় কেন?

উত্তর 38 ঃ ময়লা কম্বল বা কার্পেট পেটালে ওটা হঠাৎ গতিশীল হয়, কিন্তু ওদের ভেতর সুতোর ফাঁকে ফাঁকে আটকানো ধূলো স্থিতিজড়তার জন্যে স্থির থাকতে চায় বলে তখন সহজেই বের হয়ে যায়।

প্রশ্ন 39 ঃ কোন স্থির বস্তুর ওপর সমান ও উল্টো-মুখো দুটো বল কাজ করলে কি হয়?

উত্তর 39 ঃ একটা বলের কাজ অন্যটার কাজে নষ্ট হয়। বস্তুটা স্থিতিতেই থাকে।

প্রশ্ন 40 ঃ ক্রিকেট বল আস্তে ছুঁড়লে সহজেই লুফে নেয়া যায়, কিন্তু জোরে ছুঁড়লে লুফে নেয়া শক্ত হয় কেন?

উত্তর 40 ঃ দ্বিতীয়ক্ষেত্রে বলের গতিবেগ বেশী হওয়ায় ভরবেগ বেশী হয় বলে বলটাকে লুফে থামাতে বেশী বল দিতে হয়।

প্রশ্ন 41 ঃ ঘুরছে এমন একটা বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ বন্ধ করবার পরও ওটা কিছুক্ষণ চলে তারপর থামে কেন?

উত্তর 41 ঃ ঘুরছে এমন পাখাটার সব অংশ গতি-জড়তা লাভ করে ঘোরার জন্য। সুইচ বন্ধ করার পরেও ঐ গতিজড়তার জন্যে ওটা আগের গতি বজায় রাখবার চেষ্টা করে বলে ওটা আরো কিছুক্ষণ ঘুরে তারপর থামে।

প্রশ্ন.42 ঃ নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী বলের ক্রিয়া জোড়ায় জোড়ায় হয় অর্থাৎ একটা বল থাকলেই সমান ও উল্টো আর একটা বল থাকবে। নীচের ক্ষেত্রগুলোতে ঐরকম একজোড়া বল কোথায়, নির্দেশ কর।

(i) মেঝে থেকে কোনো ভারী বস্তু ওপরে তোলা হল।

(ii) হাত দিয়ে দেয়ালে জোরে চাপ দেয়া হল।

(iii) দুটো গাড়ীতে ধাক্কা লাগলে।

উত্তর 42 ঃ বস্তুটার ওপর যে বল দেয়া হয়েছে তা হল ক্রিয়াবল এবং বস্তুটি প্রয়োগকারীর ওপর সমান ও উল্টোমুখো যে বল দিচ্ছে তা প্রতিক্রিয়া বল। ক্রিয়া যতক্ষণ থাকে প্রতিক্রিয়াও ততক্ষণ থাকে।

(ii) হাত দিয়ে দেয়ালে চাপ দেয়া হল ক্রিয়া এবং দেয়াল যে সমান ও উল্টোমুখো বল দিচ্ছে তা হল প্রতিক্রিয়াবল।

(iii) প্রত্যেক গাড়ী অন্যটার ওপর সমান ও উল্টো-মুখো বল দেয়।

জয়পুরিয়া কলেজ, কলকাতা-5

• মজার ছবি •

বিচিত্র গাছ আজও বিস্ময়

পথিক মণ্ডল

এই পৃথিবীতে এমন অনেক গাছ আছে যারা মানুষ অথবা জীবজন্তুর মাস খেয়ে জীবনধারণ করে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের গভীর অরণ্যে এই মাংসভোজী গাছ এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

কয়েকজন অভিযাত্রীদের মতে ডেভিল ট্রী দেখতে অনেকটা তালগাছের মত এবং এদের শাখা-প্রশাখা গুলি অক্টোপাশের বাহুর মত। বন্য জীবজন্তু বা মানুষ কাছে এলেই বাহুগুলি মুহূর্তে সজীব হয়ে ওঠে ও তাদের জাপটে ধরে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলে।

স্থানীয় বন্য অধিবাসীরা ডেভিল ট্রীকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে থাকে এবং দেবতার নৈবেদ্য স্বরূপ সুন্দরী ও সুলক্ষণা কুমারীদের বৎসরের একটি বিশেষ দিনে এই রাক্ষুসে গাছের কবলে নিক্ষেপ করে আনন্দ পায়। একজন ইউরোপীয় কর্পূর সংগ্রহকারী ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের গভীর অরণ্যে কর্পূর সংগ্রহ করতে গিয়ে বন্য অধিবাসীদের রাত্রি কালীন আমোদ প্রমোদের সময় এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছিলেন।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে নানা প্রকার মাংসভোজী ও পতঙ্গভোজী উদ্ভিদ দেখা যায়। এমন অনেক গাছ আছে যারা মানুষ খেকো গাছের চেয়ে কোন অংশে কম মারাত্মক নয়।

আর্জেন্টিনার বিশাল অরণ্যময় প্রদেশের ভ্যাম্পায়ার ট্রী ভয়ঙ্কর রক্তলোভী গাছ। এই গাছের পাতায়—এমন মনবিবশ করা গন্ধ আছে যে জীবজন্তু আকৃষ্ট হয়ে গাছের কাছে এলেই তাদের ভীষণ ঘুম পায়। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে সেই জীবজন্তু ঘুমিয়ে পড়লে রক্ত-লোভী ভ্যাম্পায়ার ট্রী ধীরে ধীরে তাদের রক্ত শোষণ করে নিঃশেষ করে ফেলে।

ব্রাজিলের ম্যানবিনীল গাছের ফুল ভয়ঙ্কর প্রাণীঘাতী-বিষে ভরপুর। আমাজন নদীর অববাহিকায় গভীর অরণ্য-সঙ্কুল প্রদেশে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। দুঃসাহসী আভিযাত্রীদের কাছে শোনা যায় যে, বসন্তকালে যখন এই গাছে ফুল ফোটে তখন যদি বাতাসের সাহায্যে কণামাত্র পরাগ কারো নাকের মধ্যে দিয়ে দেহের ভেতরে ঢোকে তবে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হবে। আবার ভেনেজুয়েলার টাইগার ট্রী মানুষ অথবা জীবজন্তু নিকটবর্ত্তী হওয়া মাত্রই তাদের গায়ে এক রকম বিষাক্ত রস ছুঁড়ে দেয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্ভিদ অ্যাডেনার বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু হলে দশ মিনিট পরে মৃতের দেহে কোন রকম বিষের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার কড়া সতর্কতার সঙ্গে অ্যাডেনা থেকে বিষ তৈরীর পদ্ধতিটি গোপন করে রেখেছেন।

আমাদের দেশে যবদ্বীপে উপাস নামে এক প্রকার গাছের পাতা থেকে এমন মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস বের হয় যে কোন জনপ্রাণী ভুলেও তার ধারে কাছে ঘেঁসে না। শোনা যায়, কাছাকাছি কোথাও নদী থাকলে সেখানে নাকি মাছ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। এমনকি গাছের উপর দিয়ে কোন পাখি উড়ে গেলেও তারা বিষাক্ত গ্যাসের অভাবে তক্ষুনি মারা যায়। এখনও এখানকার অধিবাসীরা শত্রু পক্ষকে পর্য্যুদস্ত করার জন্য তীর, বল্লম, বর্শা ইত্যাদির মাথায় এই গাছের বিষ ব্যবহার করে থাকে।

আসামের বনে জঙ্গলে কলস উদ্ভিদ বা ঘটপত্রী নামে এক প্রকার পতঙ্গভোজী উদ্ভিদ দেখা যায়। এদের পাতার মধ্যশিরা লম্বা হয়ে আগার দিকে বেড়ে যায় ও সেখানে কলসের মত একটি পাত্র সৃষ্টি হয়। কলসের মুখে একটি রঙ্গীন ঢাকনা থাকে এবং তার মধ্যে কিছুটা সুগন্ধি মিষ্টরস থাকে। কীটপতঙ্গ লোভে পড়ে এই রস পাণ করতে এসে বসা মাত্র রসে ডুবে প্রাণ হারায়। তখন কলসের উপরের ঢাকণাটি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। এই ভাবে কীটকে উদ্ভিদ হজম করে ফেলে।

তাছাড়া খালে বিলে ও মজা পুকুরে ঝাঁঝি নামে এক রকম পতঙ্গভোজী জলজ উদ্ভিদ আছে। এদের শিকড়ের গায়ে কীট পতঙ্গ ধরার ফাঁদ থাকে। পতঙ্গভোজী উদ্ভিদরা কীট পতঙ্গের দেহ থেকে নাইট্রোজেন পাওয়ার জন্য তাদের ধরে খায়।

ভারতের মধ্যে এবং বিদেশে আরো কতই না বিচিত্র গাছ গাছড়া আছে ; আমরা হয়তো আজও জানতে পারি নি। তবে কোর্ট কাছারী ও ষ্টেশন এলাকায় বিভিন্ন রকমের সাপুড়ে, বেদ, ওঝা ও ফকিরবাবাদের কাছ থেকে অজানা অনেক গাছের সন্ধান পাওয়া যায়।

নিউবারাকপুর ষ্টেশন রোড় ইস্ট, 24 পরগণা।

অলিভকুমার ঘোষ

রাতের অন্ধকারে ঝোপ-ঝাড়ে এক রকম সবুজাভ হলদে আলো জ্বলতে আর নিভতে দেখা যায়। এটা জোনাকীর আলো। বর্ষার রাতে যখন চাঁদের আলো ম্লান হয়ে যায় তখন জোনাকীর এই সবুজাভ হলদে আলোর রোশনাই এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে।

সব জোনাকীর আলো কিন্তু সমান উজ্জ্বল নয়। যে সব জোনাকীর আলো অত্যন্ত ক্ষীণ তারা পুরুষ জোনাকী, এদের ডানা থাকে। স্ত্রী জোনাকীদের ডানা থাকে না। স্ত্রী জোনাকীদের আলো উজ্জ্বল হয়। এই উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে এরা পুরুষ জোনাকীদের আকর্ষণ করে। আমেরিকার এক বিশেষ প্রজাতির জোনাকী (বৈজ্ঞানিক নাম Photonus pyralis) এর ব্যাতিক্রম। ওদের পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েরই দেহে উজ্জ্বল আলো দেখা যায়।

জোনাকীর দেহে ষষ্ঠ এবং সপ্তম উদর খণ্ডে কতকগুলি বিশেষ ধরণের কোষ থেকে এই আলো উৎপন্ন হয়। এই কোষগুলিকে আলো উৎপন্নকারী যন্ত্রও বলা যায়। কোষগুলির বেশীর ভাগই এদের স্বচ্ছ দেহ আবরণীর (cuticle) নীচের শ্বাসনালীর চারপাশে থাকে। পৃথিবীতে প্রায় দু হাজার প্রজাতির জোনাকী দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রজাতিতে এই আলো উৎপন্নকারী যন্ত্রের অবস্থান এবং সংখ্যা বিভিন্ন। বিভিন্ন প্রজাতি অনুযায়ী জোনাকীর আলোর পরিমাণ কম বেশী হয়ে থাকে এবং আলোও নানা রঙের হয়। যেমন লাল, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা ইত্যাদি।

জোনাকীর আলো শুধু পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নয়, জীবন চক্রের লার্ভা দশাতেও দেখা যায়। জোনাকীর আলোকে 'ঠাণ্ডা আলোক' (cold light) বলা হয়, কারণ এই আলোর উজ্জ্বলতা আছে, কিন্তু উত্তাপ নেই। এই আলো আলোক চিত্রের ফিল্মের উপর ক্রিয়া করে। অতি বেগুনী (ultra-violet) ও অবলোহিত (Infra-red) রশ্মি এই আলোতে থাকে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেমন করে জোনাকীর দেহে এই ঠাণ্ডা আলোর সৃষ্টি হয় ? একটু জটিল ব্যাপার। কোন ধাতুর দণ্ডকে যদি ক্রমাগত উত্তপ্ত করা হয় তাহলে দণ্ডটি প্রথমে লাল রঙের (Red-hot) এবং পরে সাদা হয়ে যায়। এই শ্বেততপ্ত (White-hot) দণ্ড থেকে আগুনের ফুলকি বের হয়। এখানে তাপ থেকে আলোর রূপান্তর ঘটে। কিন্তু তাপ প্রয়োগ না করেও যদি কোন বস্তু থেকে আলো বিকীর্ণ হয় তাহলে সেই ঘটনাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় লুমিনিসেন্স বা আলোক প্রভা (luminiscence)।

কোন কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আলোক প্রভার সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে তাপ দিতে হয় না। বিক্রিয়ার ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপশক্তি বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অণুগুলিকে উজ্জীবিত করে এবং আলোক রশ্মির বিকিরণের মাধ্যমে ঐ শক্তি নির্গত হয়। হলদে ফস্‌ফরাস বাতাসে জ্বলে উঠে নীলাভ আলো বিকিরণ করে, এটা অনেকেই দেখেছ। এক্ষেত্রে ফসফরাসের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটে। এইভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে কোন প্রাণীর দেহ থেকে আলো বিকির্ণ হলে তাকে বায়োলুমিনিসেন্স (Bioluminiscence) বলা হয়। জোনাকীর আলো এই বায়োলুমিনিসেন্সের একটি পরিচিত ঘটনা।

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

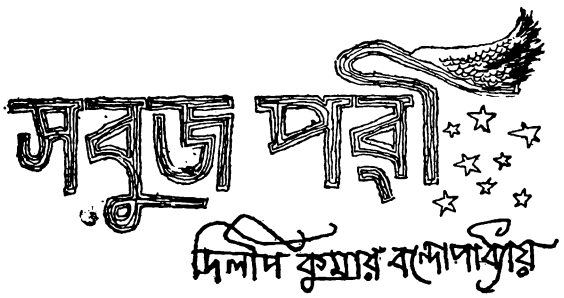

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বাবা যখন মাকে বললেন, 'এখন তো মিঠুয়াদের স্কুল ছুটি, চল, মাসখানেকের জন্য সবাই মিলে ঘুরে আসি বীরভূম থেকে—', তখন মিঠুয়ার খুব আনন্দ হয়েছিল।

কারণ ধুলো, কালি, ধোঁয়া, লোডশেডিং, যানবাহনের জটিলতা—সব মিলিয়ে কলকাতার জীবন ক্রমে এক ঘেয়ে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া মিঠুয়ার বেশির ভাগ বন্ধুরাই এখন কলকাতার বাইরে। তাই স্কুলের এই এক-মাস ছুটি কলকাতায় একলা কীভাবে কাটাবে ও। তার চেয়ে বরং বীরভূমের খোলামেলা উদার পরিবেশে সময়টা কাটবে ভালো।

মিঠুয়ার বাবা এগরিকালচারাল অফিসার। তাই বাবার অফিসের কাজে মাসখানেকের জন্য সিউড়ি শহর থেকে মাইল পনেরো দূরে এক এগরিকালচার ফার্মে গিয়ে উঠল ওরা সবাই। ওরা মানে বাবা, মা, দিদি পরমা ও মিঠুয়া। দিদি পরমা কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের বি. এ ক্লাসের ছাত্রী।

সেই এগরিকালচার ফার্মের ভেতরে সুন্দর ছবির মতো বাংলো। দু'টো শোবার ঘর. রান্নাঘর, ডাইনিং রুম, বাথরুম। কলের জল অবশ্য নেই, কিন্তু জলের জন্য রয়েছে বাঁধানো কুঁয়ো, কুঁয়োর জল টলটলে পরিষ্কার। এই জল খেয়ে কদিনেই ক্ষিদে বেড়ে গেল অনেক। বেশ বড় আকারের ফার্ম। সেখানে কত রকমের তরিতরকারি যে চাষ হচ্ছে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

এগরিকালচার ফার্মের ইনচার্জ মিঃ পাল সেদিন বিকেলে মিঠুয়া আর পরমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো ফার্মটা দেখাচ্ছিলেন। এই ফার্মে ফলানো বিরাট সাইজের শালগম দেখে মিঠুয়া আর পরমা তো দারুন অবাক। এত বড় শালগম ওরা কেউ কোনদিন চোখেই দেখেনি। শুধুই কি শালগম,—ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, মটরশুঁটি, বেগুন, টমেটো যা ফলেছে, তা দেখলে মন ভরে ওঠে। ফার্মের তাজা তরকারি, কী স্বাদ তাতে। পরমা তেমন কিছু রান্নাবান্না শেখেনি, তবু সেদিন দুপুরে পরমার রান্নাই অমৃত মনে হচ্ছিল।

ফার্মের বাইরে চারপাশে ধানক্ষেত। সবুজ ধান, পেকে হলুদ হয়ে গেছে। তাই মাঠে মাঠে ধান কাটা চলছে, ভোর থেকে রাত পর্যন্ত।

মিঠুয়ার সারাদিন কাটে জঙ্গলে মাঠে ঘুরে। কখনো ফার্মের কর্মীদের সঙ্গে থেকে সব্জি ফলানোর খুঁটিনাটি শেখে, নয়তো ধান ক্ষেতে গিয়ে চাষীদের ধানকাটা দেখে, আবার কখনো বা জেলেরা মাছ ধরবার জন্য জাল ফেললে ছুটে চলে যায় পুকুর পাড়ে। বাবা ব্যস্ত থাকেন ফার্মের নানা ধরনের কাজে, মা থাকেন রান্নাঘরে অথবা বারান্দায় বসে রোদ পোহান আর পরমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে মিঃ পালের মেয়ের সঙ্গে। ওখানেই কেটে যায় অনেকটা সময়। তখন বনে বাঁদাড়ে একা একা বেড়ায় মিঠুয়া।

সেদিন বিকেলে একটা টিলার মাথায় ঘাসের ওপর হাত পা মেলে সটান হয়ে শুয়ে ছিল মিঠুয়া। মাথার ওপরে, ঘন নীল আকাশ, বিকেলের পড়ন্ত রোদ। শুয়ে শুয়েই দেখতে পাচ্ছিল গরুর গাড়িতে কাটা ধান চাপিয়ে ঘরের দিকে ফিরছে চাষীর দল। অর্জুন গাছের নিচে নরম সবুজ গাছের ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে চোখ বুজে এলো মিঠুয়ার।

বেশ খানিকক্ষণ পর হঠাৎ কীসের শব্দে যেন ঘুম ভেঙ্গে যায় মিঠুয়ার। চোখ কচলে উঠে বসে দেখে মিঠুয়া ওর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এক সবুজ পরী। কোন পরীকে আজ পর্যন্ত নিজের চোখে দেখে নি, পরীদের কথা যা বইতে পড়েছে আর আঁকা ছবি দেখেছে, তা দেখে একে পরী বলেই মনে হলো। দেখতে অবিকল যে কোন সুন্দরী মেয়ের মতো, শুধু কাঁধের সঙ্গে লাগানো দু'টো সবুজ পাখা। পরীর শরীরে জড়ানো সবুজ রংয়ের পোষাক। পোষাকটা বাঙ্গালী মেয়ের শাড়ি নয়, অনেকটা জাপানী মেয়েদের কিমোনোর মতো।

চোখের এত সামনে পরীকে দেখে মিঠুয়া তো দারুণ অবাক। ওর ধারনা ছিল পরীরা নিতান্তই কল্পনার জগতের মানুষ, কিন্তু তাদেরও যে চোখ দিয়ে দেখা যায়, ইচ্ছে করলে হাত দিয়ে ছোঁয়াও যায়, একথা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না মিঠুয়া।

ওকে দেখে হাসল সবুজ পরী। সবুজ পরীকে এত কাছে দেখে শুধু অবাক নয়, সত্যি বলতে কি, একটু ভয়ও

পেয়েছিল মিঠুয়া। কিন্তু পরীর মিষ্টি হাসিতে মিঠুয়ার মনের ভয় গলে জল হয়ে গেল।

পরীর মিষ্টি হাসির উত্তরে কিছু নিশ্চয়ই বলা দরকার। কিন্তু পরীর সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলবে ভেবে পেল না মিঠুয়া। পরীরা কি বাংলা ভাষা বোঝে না বলতে পারে। নাকি ইংরেজি, জাপানী, চীনা, ফরাসী অথবা জর্মন।

কিন্তু মিঠুয়া কিছু বলবার আগেই সবুজ পরী পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'তোমার নাম তো মিঠুয়া, তাই না—'

মিঠুয়া তো অবাক। এ এক আশ্চর্য পরী, শুধু মিঠুয়ার ভাষা নয়, নামটা পর্যন্ত নিমেষে জেনে ফেলেছে।

সবুজ পরী আগের মতোই অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে বলে চলে, 'তুমি অবাক হচ্ছ আমি তোমার ভাষা, নাম জানলাম কী করে, তাই না! আসলে আমরা তো পরী, তাই এই পৃথিবীতে কোথায় কে রয়েছে, কী হচ্ছে, তার সব হদিস পেয়ে যাই।'

'তুমি কি এই পৃথিবীতেই থাক নাকি অন্য কোথাও? তোমার নাম কি? তোমার বাবা-মা-ভাই-বোন আছে?' এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে হাঁপাচ্ছিল মিঠুয়া।

মিঠুয়ার কথা শুনে অল্প কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সবুজ পরী, তারপর একটু যেন দুঃখের স্বরে বলে, 'আমি কিন্তু পরী নই, অনেকটা তোমাদের মতোই মানুষ। তবে পৃথিবী নয়, অন্যগ্রহের মানুষ। কিন্তু সেখান থেকে বেরোতে হলো আমাকে। অনেক কষ্টে দুঃখে তোমাদের গ্রহে এসেছি, আসতে হয়েছে।'

পরীদেরও যে দুঃখ আছে, তাদেরও যে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়, একথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেল মিঠুয়া। মনে মনে খানিকটা সহানুভূতিও বোধ করল সবুজ পরীর জন্য।

তাই বিষন্ন গলায় জিজ্ঞেস করে মিঠুয়া, 'কেন, কেন তুমি আমাদের এই পৃথিবীতে এলে নিজের ঘর বাড়ি দেশ ছেড়ে? তোমার বাবা-মা কি তোমার জন্য ভাববে না, কষ্ট পাবে না!'

মিঠুয়ার কথা শুনে সবুজ পরী হাসল। কিন্তু সে হাসি বড় দুঃখের।

করুণ গলায় বলে সবুজ পরী, 'আমার বাবা-মা বোধহয় আর বেঁচে নেই। ওদের বড় কঠিন অসুখ হয়েছে। ডাক্তাররা ওদের জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের গ্রহে তৈরি হয় যত রকমের ওষুধ, তা' সব খাইয়েও বাবা-মাকে সুস্থ করে তোলা যাচ্ছে না—'

উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করে মিঠুয়া, 'কেন, কী এমন শক্ত অসুখ করেছে তোমার বাবা মায়ের—'

'সে অসুখের নাম বললেও তুমি বুঝতে পারবে না।

তুমি কি এই পৃথিবীতেই থাক?

তোমাদের পৃথিবীতে তো এখনো সেই রোগ হয় নি। তবে হবে নিশ্চয়ই একদিন। পৃথিবীর যা অবস্থা দেখছি, তাতে হয়তো আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সে রোগ দেখা দেবে এখানে।'

'সত্যি!' শংকিত গলায় বলে মিঠুয়া।

সবুজ পরী বলে চলে, 'আমার বাবা-মায়ের হয়েছে আসবুজা অসুখ। এই অসুখ হয় যদি দীর্ঘদিন মানুষ সবুজ তরিতরকারি না খেতে পায় তবেই। জান তো, আমার বাবা-মা গত দশ বছর কোন সবুজ তরিতরকারি খায় নি। আমিও খাই নি। তবে আমার বয়েস কম, তাই এখনো রোগে ধরে নি আমাকে। কী বলব তোমাকে আমাদের গ্রহের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে। বাতাসে অক্সিজেন মাঝে মাঝে এত কমে যায় যে তখন আমাদের পরে নিতে হয় অক্সিজেনের মুখোশ। কল-কারখানার ধোঁয়ায়, আবর্জনায় নদী পুকুরের মাছ মরে

গেছে। মাটির উর্বরা শক্তি এত কমে গেছে, যে মাটিতে আর কোনরকম চাষবাস করা যাচ্ছে না। কিন্তু বলো, কারখানায়, ল্যাবরেটরিতে তৈরী করা খাবার খেয়ে মানুষ কতদিন সুস্থ থাকতে পারে!'

পরীর কথা শুনে খুবই বিষন্ন বোধ করে মিঠুয়া। কী করে সবুজ পরীকে সাহায্য করা যায়, সে কথাই ভাবতে থাকে। ও বলে, 'আমার বাবা এগরিকালচারাল অফিসার। আমাদের ফার্মে অনেক তরিতরকারি আছে। নেবে তুমি? যত খুশি, তুমি নিয়ে যাও—'

মিঠুয়ার কথায় পরীর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'হ্যাঁ, পৃথিবী থেকে টাটকা সবুজ তরিতরকারি নিয়ে যাবার জন্যই তো এসেছি। গ্রহের ডাক্তাররা বলেছেন, পৃথিবী থেকে যদি টাটকা সবজি নিয়ে বাবা-মাকে খাওয়াতে পারি, তাহলে হয়তো ওঁরা এবারের মতো বেঁচে যাবেন। চল, যাই তোমার সঙ্গে। দেখি, তোমাদের ফার্মের তরকারি খাইয়ে যদি বাবা-মাকে বাঁচাতে পারি—'

সবুজ পরী আর মিঠুয়া দুজনে একসঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। পৃথিবীর মাটি সবুজ পরীর অপরিচিত, তাই সবুজ পরী ঠিক যেন হাঁটতে পারছে না, অনেকটা উড়ে চলেছে রাস্তার ওপর দিয়ে।

এদিকে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পাড়াগেঁয়ে জায়গা, ইলেকট্রিকের আলো নেই। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় চলতে কিছুটা অসুবিধে হচ্ছে। মিঠুয়া রাস্তার ওপর একবার হোঁচট খেতেই সবুজ পরী কী যেন করল, সুইচ অন করার মতো খুট করে একটা শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে সামনের রাস্তাটা যেন আলোয় ভরে গেল। মিঠুয়া তাকিয়ে দেখে, সবুজ পরীর সারা শরীর নীলাভ আলোয় ঝকঝক করছে।

ফার্মের কাছাকাছি আসতেই সবুজ পরী বলল, 'আমি বরং এই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকি। তুমি বরং এই থলেটা নিয়ে—'

সবুজ পরীর হাত থেকে থলেটা নিয়ে মিঠুয়া পা টিপে টিপে এগলো ক্ষেতের দিকে। ও ভাবছিল, অন্ধকারের মধ্যে কী করে ক্ষেত থেকে তরকারি তুলবে? কিন্তু সবুজ পরীর দেওয়া থলেটার ভেতর থেকেও হালকা আলো বেরিয়ে আসছে। ফলে আশেপাশের খানিকটা জায়গা বেশ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! ক্ষেতের ভেতর থেকে বেশ কিছু বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি আর টমেটো তাড়াতাড়ি তুলে ফেলল। বলা যায় না, কেউ দেখে ফেললে হয়তো বকবে ওকে। কিন্তু এত তরিতরকারি তুলে ফেলে একটু চিন্তায় পড়ে। সবুজ পরীর দেওয়া থলেটা বড়ই ছোট, এর ভেতরে কি এত সব জিনিস ধরবে? কিন্তু এটা এক আশ্চর্য ম্যাজিক থলে। এর ভেতরে চারটি বাঁধাকপি, তিনটি ফুলকপি, এক ডজন ওলকপি, আর চার-পাঁচ কেজির মতো টমেটো এটে গেল অনায়াসেই। তবুও যেন আরো অনেকটা জায়গা থেকে গেল থলের ভেতরে। শুধু তাই নয়, এতসব জিনিস ভরবার পরও থলেটা সেই আগের মতোই হালকা, ফুরফুরে। তরকারি-ভরা থলেটা নিয়ে মিঠুয়া ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো আগের জায়গায়।

কিন্তু মিঠুয়া অবাক, কেউ তো সেখানে নেই। অথচ—। এবার হাতের থলের দিকে তাকায়, যেটা ওকে দিয়েছিল সবুজ পরী। কিন্তু তাকিয়ে দেখে, সবুজ পরীর দেওয়া থলে তো নয়, সেটা ওদের নিজেদেরই থলে।

মিঠুয়া বিষন্ন হয়ে ভাবে, তবে কি এতক্ষণ জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিল। অথচ তাই বা কী করে সম্ভব! সবুজ পরীর সুন্দর মুখখানা ওর স্মৃতিতে এখনো কত স্পষ্ট!

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ননগ্রীম হিলস, শিলং।

'সুপার নলেজ ক্যুইজ' প্রতিযোগিতায় যারা সান্ত্বনা পুরস্কার পেয়েছ, তাদের ডাকযোগে পুরস্কার পাঠানো হয়েছে।

—সম্পাদক

'1984'র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর জন্য

ঐচ্ছিক জীববিদ্যা ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

দিনোজকুমার দে

1. সালোকসংশ্লেষ কাহাকে বলে? এই প্রক্রিয়ায় কি কি উপাদানের প্রয়োজন? এই প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা কি ভাবে উপকৃত হই? সালোকসংশ্লেষে যে গ্যাস বায়ু হইতে গৃহীত হয় তাহার উৎস কি? উদ্ভিদের ভূনিম্থ অঙ্গে সালোকসংশ্লেষ হয় না কেন? একটি পরীক্ষাদ্বারা প্রমান কর যে, সালোকসংশ্লেষে উদ্ভিদ অক্সিজেন গ্যাস পরিত্যাগ করে। চিত্রসহ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর যে আলো ও কার্বন-ডাই অক্সাইড ছাড়া সালোক সংশ্লেষ হয় না।

2. বাষ্পমোচন কাকে বলে? উদ্ভিদের জীবনে বাষ্প-মোচনের গুরুত্ব কি? বাষ্পমোচনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত-গুলি কি কি? পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ কর উদ্ভিদের বাষ্প-মোচন হয়।

3. মূল কাহাকে বলে? একটি আদর্শ-মূলের কয়টি অংশ দেখতে পাওয়া যায়? অংশগুলির বর্ণনা দাও ও কার্যকারিতা লিখ। মূলের সাধারণ ও বিশেষ কার্যগুলি উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তিত মূলের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

4. অঙ্কুরোদগম কাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের একটি করিয়া উদাহরণ দাও। অঙ্কুরোদ্গমের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ কি কি? একটি একবীজপত্রী ও একটি দ্বিবীজপত্রী বীজের অঙ্কুরোদগমের বর্ণনা দাও।

5. ছক ও উদাহরণ সহ উদ্ভিদজগত ও প্রাণীজগতের বিভাগের বর্ণনা দাও।

6. পুষ্টি অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগের বর্ণনা দাও।

7. (a) ফার্ণের জীবন ইতিহাস বর্ণনা কর এবং ইহার জীবন চক্রের বিভিন্ন অবস্থার চিত্র অঙ্কন কর।

মিউকরের সহিত ইহার জীবন ধারণ পদ্ধতির প্রধান পার্থক্য কি?

(b) মিউকর ও স্পাইরোগাইরার জীবন প্রণালীর পার্থক্য লিখ।

8. চিত্রসহ একটি সম্পূর্ণ ফুলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও ও প্রতিটি অংশের কার্য উল্লেখ কর। পরাগ যোগ কাকে বলে? স্বপরাগযোগ ও বিপরীত পরাগযোগের পার্থক্য বর্ণনা কর। বিপরীত পরাগ-যোগের সুবিধাগুলি কি কি?

ফল ও বীজের বিস্তার বলিতে কি বোঝ? ইহার প্রয়োজনীয়তা কি? বায়ু, জল ও প্রাণী দ্বারা ফল ও বীজের বিস্তার উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর।

10. নিম্নলিখিত উদ্ভিদগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ ঃ—

(a) কার্পাস (b) পাট (c) নারকেল (d) ধান (e) সরিষা।

11. পার্থক্য লিখ ঃ

(a) মূল ও কাণ্ড (b) যৌগিক পত্র ও শাখা (c) বাষ্পমোচন ও শ্বাসক্রিয়া (d) প্রোথ্যালাস ও প্রোটোনিমা।

12. প্রাণীজগতের পর্বগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। প্রতিটি পর্বের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও। মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্যগুলি উল্লেখ কর।

13. কুনো ব্যাঙের ফুসফুসীয় শ্বাসতন্ত্রের বিবরণ দাও। ব্যাঙ এই তন্ত্র ছাড়া আর কি ভাবে শ্বাসকার্য সম্পাদন করে? শীতঘুম কাহাকে বলে?

14. কুনো ব্যাঙের খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি এবং পৌষ্টিক-তন্ত্রের বিবরণ দাও।

15. রূপান্তর বলিতে কি বোঝ? চিত্রসহযোগে কুনো ব্যাঙের জীবন ইতিহাস অবলম্বনে রূপান্তর ব্যাখ্যা কর।

16. পুং ও স্ত্রী ব্যাঙের পার্থক্য কি? চিত্রের সাহায্যে পুং ও স্ত্রী ব্যাঙের জনন তন্ত্রের বর্ণনা দাও ঃ—

17. বহিরাকৃতির বিবরণ দাও ঃ—

(a) টিকটিকি (b) গিনিপিগ

18. মশার জীবন চক্র বর্ণনা কর। মশা ও মৌমাছির শূককীটের পার্থক্য কি? মশক বাহিত দুটি রোগ জীবানুর নাম কর। মৌমাছি কয় প্রকার? মৌমাছিকে সামাজিক প্রাণী বলা হয় কেন? মধু কি?

19. নিম্নলিখিত প্রাণী গুলির মধ্যে কোন্‌টি উপকারী এবং কোনটি অপকারী? ইহাদিগকে এইরূপ আখ্যা দেওয়া হয় কেন?

(a) কেঁচো (b) মাছি (c) মশা (d) মৌমাছি।

20. টীকা লিখ ঃ—

(a) ব্যাঙের অগ্নাশয় (b) ব্যাঙের যকৃত (c) (c) মাছের ফুলকা (d) মৌমাছির শূককীট (e) অতি-রিক্ত শ্বাসতন্ত্র (f) নিলয়।

বুলচন্দ্রপুর, পাঁইটা, বর্ধমান

বীজগণিতীয় পদ্ধতি ব্যবহারে সতর্ক হওয়া উচিত

অসীম মুখোপাধ্যায়

মাধ্যমিক পরীক্ষায় কয়েকটি প্রশ্ন থাকে যেগুলি বীজগণিতীয় পদ্ধতিতে সহজেই সমাধান করা যায়। এই প্রশ্নগুলির মধ্যে পাটীগণিতের প্রশ্নও অন্তর্ভুক্ত। অনেকেরই ধারণা যে পাটীগণিতের সমস্যাদি পাটীগণিতের পদ্ধতিতেই করতে হবে, বীজগণিতের পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলবে না। এই বিতর্কের অবসানের জন্য মাধ্যমিকের প্রশ্ন পত্রে 'বীজগণিতের পদ্ধতি ব্যবহার করা যাইতে পারে', এই উক্তি দেখা যায়। নিঃসন্দেহ যে বীজগণিতীয় পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ; অনেক বুদ্ধির প্রশ্ন আছে যা সমাধান করার কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় না, সে ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর। এই পদ্ধতির প্রতি গণিত অনুরাগী প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর সচেতন হওয়া উচিত এবং এটির অনুশীলন করা উচিত, কারণ ভবিষ্যৎ জীবনে বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগ করতে হলে এর অনুশীলন ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রয়োজন।

এই পদ্ধতি প্রয়োগে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকার দরুণ বেশীর ভাগ পরীক্ষার্থী সফলকাম হয় না। প্রদত্ত সমস্যাটি ভালমত না বুঝলে সমাধানে অগ্রসর হওয়াও উচিত নয়। এই পদ্ধতি প্রয়োগে কয়েকটি বিশেষ ধাপ আছে, সেগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হওয়া দরকার।

প্রথম ধাপে প্রশ্নটি বারবার পড়ে প্রকৃত বক্তব্য কি তা বুঝে নেওয়া চাই। প্রশ্নের অর্থ বোঝার ত্রুটিতে বহু পরীক্ষার্থী সমাধানের সময় বিপথে অগ্রসর হয় এবং পদ্ধতির ওপর যথেষ্ট দখল থাকা সত্ত্বেও নম্বর পায় না। তাছাড়া এই ধাপ পরবর্তী ধাপের একটি প্রস্তুতিপর্ব। কোনো কোনো সময় দেখা যায় প্রশ্নে ভাষার অস্পষ্টতা প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ উদ্‌ঘাটনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। যদিও এই সব ক্ষেত্রে সব রকম যৌক্তিক উত্তরই পরীক্ষক গ্রহণ করে থাকেন তবু ভাষা-মাধ্যমের ওপর পরীক্ষার্থীর নিজস্ব কোনো দুর্বলতা থাকা আদৌ অভিপ্রেত নয়।

দ্বিতীয় ধাপ। এই ধাপের কাজ প্রদত্ত বিবৃতিমূলক প্রশ্নটিকে গাণিতিক সঙ্কেত বা সমীকরণের মাধ্যমে সূত্রবদ্ধ করা। তাই এই ধাপটিকে অনুবাদের ধাপ বলা যেতে পারে, ব্যবহারিক ভাষা থেকে গাণিতিক ভাষায় রূপান্তর। সমস্যাটির সাঙ্কেতিকীকরণই বীজগণিতীয় পদ্ধতি প্রয়োগে সাহায্য করবে। বুঝে নিতে হবে প্রশ্নে কি চাওয়া হয়েছে এবং কি দেওয়া আছে। যা চাওয়া হয়েছে তাকেই অজ্ঞাত রাশি x (বা অন্য কিছু প্রতীক) ধরা হয়। প্রয়োজনবোধে একাধিক অজ্ঞাতরাশি যথা x, y, z,... ইত্যাদির অবতারণা করতে হতে পারে। এরপর প্রশ্নের সর্তাদি বা বিবৃতি (অর্থাৎ প্রশ্নে যা দেওয়া আছে) অনুসরণ করে x-কে নিয়ে একটি সমীকরণ গঠন করতে হবে। অজ্ঞাতরাশির সমসংখ্যক সমীকরণ গঠিত না হলে পরবর্তী ধাপে সমীকরণসমূহের সমাধান সম্ভব হবে না। সংশ্লিষ্ট সমীকরণ/গুলি কি ভাবে গঠিত হচ্ছে তার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। উত্তরদানকালে কোনো রকম ভূমিকা ব্যতিরেকে পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট সমীকরণ/গুলি লিখতে দেখা যায়; এতে পরীক্ষক অনায়াসেই কিছু নম্বর কেটে নিতে পারেন। x, y,... ইত্যাদি প্রতীকগুলিকে সংজ্ঞায়িত করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ পরীক্ষার্থীর। 'প্রশ্নানুসারে' এই মন্তব্য অনেক সময় যুক্তির অভাব কিছুটা পূরণ করতে পারে। আশার কথা, এই ধাপের জন্য অর্থাৎ যুক্তিসহ সমীকরণ/গুলি গঠনের জন্য প্রশ্নের পুরো নম্বরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নম্বর বণ্টিত থাকে।

তৃতীয় ধাপ। এই ধাপের কাজ মোটামুটি যান্ত্রিক; দ্বিতীয় ধাপে প্রাপ্ত সমীকরণের/গুলির সমাধান পর্ব। একঘাত, দ্বিঘাত ও সহসমীকরণের সমাধান পদ্ধতিগুলি ভালমত জানা থাকা দরকার। সমাধানের সময় দুটি ধাপের মধ্যে 'বা' ব্যবহার করতে হয়; 'বা'-এর পরিবর্তে বহু পরীক্ষার্থী '=' (সমতা চিহ্ন) লেখে, এতে নম্বর কেটে নেওয়ার নির্দেশ থাকে। সমাধানের মধ্যে কোনো ধাপে কোথাও অসমঞ্জসতা দৃষ্ট হলে পরীক্ষক এই ধাপ (তৃতীয়) এবং পরবর্তী ধাপের জন্য বণ্টিত কোনো নম্বরই পরীক্ষার্থীকে দেন না। প্রাপ্ত সমাধানগুলি ঠিক হয়েছে কিনা তা সমীকরণে বসিয়ে অন্যত্র পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া উচিত। অমিল হলে, সমগ্র উত্তরের প্রতিটি ধাপ দেখে নিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর নতুন করে (প্রয়োজনে) উত্তরটি লেখা ভাল; কারণ উত্তরে কাটাকুটি, বিশেষ করে কোনো সংখ্যার, না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চতুর্থ ধাপ। এটি শেষ ধাপ; এই ধাপে প্রশ্নের উত্তরটি এককসহ সঠিক লেখার কাজ। সমাধানের সময়

অজ্ঞাত রাশির অবাঞ্ছিত মান এসে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। উত্তর লেখার সময় কেবলমাত্র বাঞ্ছিত এবং সম্ভাব্য উত্তরই লিখতে হবে। অবাঞ্ছিত উত্তরগুলি বর্জিত না হলে বা যুক্তি ব্যতিরেকে বর্জিত হলে উভয় ক্ষেত্রেই নম্বর কেটে নেওয়ার নির্দেশ থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত উত্তর বর্জিত না হলে পরীক্ষক সমীকরণ গঠনের এক-তৃতীয়াংশ নম্বর ছাড়া সব নম্বরই কেটে নিতে পারেন। সেই জন্যে এই শেষ ধাপটির প্রতি পরীক্ষার্থীর দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তৃতীয় ধাপে প্রাপ্ত সমাধানগুলি প্রশ্নপত্রের সর্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করা উচিত; এই যাচাই-এর সময় কোন্‌টি বাঞ্ছিত এবং কোন্‌টি অবাঞ্ছিত মান তা ধরা পড়ে। তা ছাড়া উত্তরের নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। যাচাই-এর সময় সমাধানের সঙ্গে প্রশ্নের কোন অসঙ্গতি দৃষ্ট হলে বুঝতে হবে সমীকরণ গঠনে বা সমাধানের মধ্যে কোথাও ত্রুটি আছে। সেক্ষেত্রে সমগ্র উত্তরটি নতুন করে করা বাঞ্ছনীয়।

কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে বীজগণিতীয় পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল দেখান হবে। ওপরে বর্ণিত ধাপগুলি মন্তব্যের মাধ্যমে নির্দেশিত হবে, বলা বাহুল্য মন্তব্যগুলি উত্তরের অংশ নয়। এর আগে একজন বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিকের বাল্যকালে বীজগণিতের ওপর অনুরাগ সৃষ্টির একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ সমীচীন বোধ হচ্ছে। এই বৈজ্ঞানিক হলেন বিশ্ববিখ্যাত আলবার্ট আইনস্টাইন (1879-1955); বাল্যকালে সম্ভবতঃ যখন তিনি চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, তখন একদিন কৌতূহলবশতঃ তাঁর কাকাকে প্রশ্ন করেছিলেন, অ্যালজেবরা কি? তাঁর কাকা ছিলেন একজন এঞ্জিনিয়ার; উত্তরে তিনি বলেছিলেন, অ্যালজেবরা এমন একটি কৌশল যা অলসপ্রকৃতির গণিত-বিদেরাই গ্রহণ করে থাকেন, কোন কিছু জ্ঞাত না থাকলে তাকে x ধরো এবং এটি জানো এই মনে করে এগিয়ে যাও, শেষে দেখবে x-এর মান পাওয়া গেছে। কথিত আছে, বালক আইনস্টাইন বীজগণিতের এই সংজ্ঞায় খুবই উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং শাস্ত্রটি ভালমত শেখার সংকল্প তখন থেকেই মনে পোষণ করেন। নিচের উদাহরণগুলির সমাধানে কাকার উক্তির সার্থকতা বোঝা যাবে।

উদাহরণ 1. একটি ধনাত্মক সংখ্যা হইতে তাহার ধনাত্মক বর্গমূল বিয়োগ করিলে 110 হয়। সংখ্যাটি নির্ণয় কর।

সমাধান—[মন্তব্য ঃ কোনো ধনাত্মক সংখ্যার বর্গমূল দুটি, একটি ধনাত্মক এবং অপরটি ঋণাত্মক]

মনে করি নির্ণেয় সংখ্যা x, এর ধনাত্মক বর্গমূল $=\sqrt{x}>0$. সর্তানুসারে, $x-\sqrt{x}=110$.

ধরা যাক, $\sqrt{x}=y$ $y^2-y=110$ বা, $y^2-y-110=0$, বা $(y-11)(y+10)=0$.

$\therefore$ $y=11, -10$. অর্থাৎ $\sqrt{x}=11, -10$; যেহেতু $\sqrt{x}$ ধনাত্মক, $\sqrt{x}=-10$ গ্রাহ্য নয়।

$\therefore \sqrt{x}=11$ বা, $x=121$.

অতএব নির্ণেয় সংখ্যাটি 121.

[মন্তব্য ঃ y-এর মান নির্ণয়ের জন্য দ্বিঘাত সমীকরণের বীজ নির্ণয়ের সূত্রটি ব্যবহার করা যেতে পারে]

উদাহরণ 2. আট বৎসর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের চারগুণ ছিল, আট বৎসর পরে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দ্বিগুণ হইবে। তাহাদের বর্তমান বয়স কত?

সমাধান—[মন্তব্য ঃ প্রশ্নে পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স চাওয়া হয়েছে, তাই তাদের নির্ণেয় (অজ্ঞাত) বয়সকে x এবং y ধরা হবে এবং সমাধানের জন্যে দুটি সমীকরণ তৈরী করতে হবে]

মনে করি পিতার বর্তমান বয়স x বৎসর এবং পুত্রের বর্তমান বয়স y বৎসর। [মন্তব্য ঃ x এবং y-এর একক 'বৎসর' এখানেই উল্লেখ করা ভাল]

আট বৎসর পূর্বে পিতার বয়স ছিল $(x-8)$ বৎসর এবং পুত্রের $(y-8)$ বৎসর।

প্রশ্নানুসারে,

8 বৎসর পূর্বে পিতার বয়স $=4\times$ 8 বৎসর পূর্বে পুত্রের বয়স

বা, $x-8=4(y-8)$ বা, $x=4(y-6)\cdots(1)$

পুনরায় আট বৎসর পরে, পিতার বয়স $=(x+8)$ বৎসর এবং পুত্রের বয়স $=(y+8)$ বৎসর হবে। প্রশ্নানুসারে তখন

পিতার বয়স $=2\times$ পুত্রের বয়স

বা, $x+8=2(y+8)$ বা, $x=2(y+4)\cdots(2)$

[মন্তব্য ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের কাজ এখানেই সমাপ্ত, পরবর্তী তৃতীয় ধাপে সমীকরণ (1) এবং (2) থেকে x এবং y-এর মান নির্ণয় করা হবে। উল্লেখ্য, সমীকরণ (1) এবং (2)-এর সঙ্গে কোন একক (বৎসর) যুক্ত হবে না]

(1) থেকে (2) বিয়োগ করে, $0=2y-32$ বা, $y=16$; y-এর এই মান (1)-এ বসিয়ে, $x=4(16-6)=40$.

[মন্তব্য ঃ x এবং y-এর মানের কোন একক হবে

না ; শেষ বা চতুর্থ ধাপে পিতাপুত্রের প্রাপ্ত বয়স প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করে (অন্যত্র) উত্তর লিখতে হবে]

উত্তর—পিতার বর্তমান বয়স 40 বৎসর এবং পুত্রের বর্তমান বয়স 16 বৎসর ।

[মন্তব্য : পিতা ও পুত্রের আট বৎসর পূর্বের বয়সকে x এবং y ধরলে, সংশ্লিষ্ট সমীকরণ হত $x=4y$ এবং $x+16=2(y+16)$; সমাধান হত $x=32$, $y=8$, এই অতীতের বয়স দুটিকে উত্তর লিখলে নম্বর কাটা যাবে, কারণ প্রশ্নে পরিষ্কার 'বর্তমান বয়স' চাওয়া হয়েছে]

উদাহরণ 3. চিনির দর 40% বৃদ্ধি পাওয়ায় কোনো গৃহস্থ চিনির ব্যবহার 25% কমাইয়া দেয়। ইহাতে ঐ গৃহস্থের চিনি বাবদ খরচ শতকরা কত বৃদ্ধি বা হ্রাস হইবে ?

সমাধান—[মন্তব্য : এই সমস্যাটি সমীকরণের মাধ্যমে সমাধান হবে না, এটি আসলে শতকরা হিসাবের অঙ্ক। এখানে দুটি বস্তুর ভূমিকা লক্ষ্য করার আছে, একটি চিনির মূল্য এবং অপরটি চিনির পরিমাণ ; তাই এটি সমাধানের জন্যে দুটি অজ্ঞাত রাশির দরকার]

মনে করি চিনির দর বৃদ্ধি হওয়ার আগে গৃহস্থের চিনির ব্যবহার ছিল x কে. জি এবং 1 কে. জি চিনির মূল্য ছিল y টাকা। তাহলে গৃহস্থের চিনি বাবদ খরচ হত xy টাকা। চিনির দর 40% বৃদ্ধি পেলে, প্রতি কে. জি চিনির দাম হয় $\frac{140}{100}y=\frac{7}{5}y$ টাকা। এই সঙ্গে গৃহস্থ চিনির ব্যবহার 25% কমিয়ে দেয়, ফলে তার চিনির ব্যবহার দাঁড়ায় $\frac{75}{100}x=\frac{3}{4}x$ কে. জি এবং বর্ধিত দরে এর মূল্য $=\frac{3}{4}x.\ \frac{7}{5}.y=\frac{21}{20}xy$ টাকা।

বর্তমান খরচ − পূর্বতম খরচ $=\frac{21}{20}xy-xy=\frac{xy}{20}$ টাকা (ধনাত্মক),

অর্থাৎ খরচের বৃদ্ধি $=xy/20$ টাকা ; এই বৃদ্ধি স্পষ্টতঃ xy টাকার ওপর,

খরচের শতকরা বৃদ্ধি $=\frac{xy}{20}.\frac{1}{xy}.100=5.$

[মন্তব্য : ইচ্ছে করলে পরীক্ষার্থী চিনির বর্ধিত মূল্য, বর্ধিত ব্যবহার এবং শেষের শতকরা বৃদ্ধি প্রভৃতি ঐকিক নিয়মের মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারে। উত্তরে 'বৃদ্ধি' না 'হ্রাস' বিষয়টির উল্লেখের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত ; বিপরীত উত্তরে, সব অঙ্কটি করা সত্ত্বেও পরীক্ষার্থী কোনো নম্বর পায় না। অবশ্য হ্রাস বা বৃদ্ধির কোনো কিছু উল্লেখ না থাকলে, সংশয়ের অজুহাতে পরীক্ষার্থী ভাল মতই নম্বর পেয়ে থাকে। প্রাপ্ত উত্তরে কোনো একক থাকবে না। পরীক্ষার্থী ভুল করে 5 টাকা বা 5% উত্তর লেখে, এতে পরীক্ষক নম্বর কেটে নেন। অবশ্য, চিনির খরচের বৃদ্ধি=5%, এও উত্তরে লেখা যায়]

উদাহরণ 4. শ্যাম যদুকে বলিল, 'আমার যখন তোমার বয়স ছিল, তোমার সেই বয়সের দ্বিগুণ বয়স আমার এখন।' শ্যাম ও যদুর বয়সের সমষ্টি 63 হইলে, তাহাদের বয়স নির্ণয় কর।

সমাধান—[মন্তব্য : প্রশ্নটির প্রকৃত অর্থ বোঝা শক্ত ; এর ইংরেজি বয়ানটিও লক্ষ্য করার মত, 'I am twice as old as you were when I was as old as you are.' প্রশ্নে পরীক্ষার্থীর গণিতজ্ঞানের থেকে ভাষা-জ্ঞান যাচাই মুখ্য উদ্দেশ্য।]

মনে করি শ্যাম ও যদুর বর্তমান বয়স যথাক্রমে x এবং y বৎসর ; $x+y=63$ (1)

যদুর থেকে শ্যাম স্পষ্টই ($x-y$) বৎসরের বড়। শ্যামের বয়স যখন y বৎসর (যদুর বর্তমান বয়স) ছিল, তখন যদুর বয়স ছিল $\{y-(x-y)\}=(2y-x)$ বৎসর।

প্রশ্নানুসারে, শ্যামের বর্তমান বয়স $=2\times$ যদুর $(x-y)$ বৎসর আগের বয়স

বা, $x=2\ (2y-x)=4y-2x$

বা, $3x=4y=4\ (63-x)\cdots(1)$ থেকে,

বা, $x=36$ এবং $y=27.$

উত্তর : শ্যামের এবং যদুর বর্তমান বয়স যথাক্রমে 36 বৎসর এবং 27 বৎসর।

উদাহরণ 5. রাম সাইকেলে ঘণ্টায় 20 কিলোমিটার ও পদব্রজে ঘণ্টায় 5 কিলোমিটার যাইতে পারে। কিছুটা সাইকেলে এবং কিছুটা পদব্রজে যাইয়া 50 কিলোমিটার পথ পৌঁছাইতে 4 ঘণ্টা লাগিল। সে কত রাস্তা সাইকেলে এবং কত রাস্তা পদব্রজে গিয়াছিল ?

সমাধান—[মন্তব্য : এই অঙ্কটি 'কিশলয়' গণিতের প্রথম অধ্যায়ে (পূর্ব বৎসরের পাঠের পুনরালোচনা) পাওয়া যাবে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে এই অঙ্ক করা কি সম্ভব ? একটি সমীক্ষা চালানোর সময় কয়েকটি বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার (চতুর্থ শ্রেণীর) প্রশ্নপত্রে এই প্রশ্নটি বর্তমান লেখকের নজরে আসে। প্রশ্নটি প্রকৃত পক্ষে গতি বা সময় ও দূরত্ব-বিষয়ক। এটির সমাধান বীজগণিতীয় পদ্ধতিতে সুন্দরভাবে করা যাবে]

সমাধান—মনে করি রাম x কিলোমিটার পদব্রজে এবং y কিলোমিটার সাইকেলে যায়। $x+y=50\cdots(1)$

তাহলে পদব্রজে যেতে সময় লাগে $= \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{গতি}} = \frac{x}{5}$ ঘণ্টা এবং সাইকেলে যেতে সময় লাগে $\frac{y}{20}$ ঘণ্টা।

মোট সময় $= \left(\frac{x}{5} + \frac{y}{20}\right)$ ঘণ্টা। প্রশ্নানুসারে মোট সময় 4 ঘণ্টা $\frac{x}{5} + \frac{y}{20} = 4$

বা, $4x + y = 80$

বা, $4x + (50 - x) = 80$, (1)-এর সাহায্যে।

$x = 10$ এবং $y = 40$.

উত্তর—রাম পদব্রজে 10 কিমি. এবং সাইকেলে 40 কিমি. গিয়াছিল।

[মন্তব্য : উত্তরটি প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করা যেতে পারে]

যে কোনো কারণেই হোক, বুদ্ধির অঙ্ক সমাধানে পাটীগণিতের প্রতিষ্ঠা হ্রাস পাচ্ছে ; হয়ত একদিন দেখা যাবে মাধ্যমিক পাঠক্রম থেকে পাটীগণিত বিদায় নিয়েছে। পাটীগণিতই আদি, গণিত ইতিহাসের পটভূমিকায় বীজগণিতের আগমন অনেক পরে। বীজগণিতের ওপর প্রথম পুস্তক রচিত হয় নবম খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় পাদে আরবী ভাষায়। বইটির নাম 'অল্‌জবর ওহ্ অলমুকাবিলা', লেখক অলখরজেমী, একজন আরবীয় গণিতবিদ। 'জবর' কথাটি চিকিৎসাশাস্ত্রের, অর্থ 'হাড় বসান।' ল্যাটিন ভাষায় পুস্তকটি ইউরোপে অনূদিত হয় এবং কালক্রমে 'অলজবর' কথাটি রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায় 'অ্যালজেবরা'-য়। নিউটন (1642-1727) এই শাস্ত্রের নাম দিয়েছিলেন 'ইউনিভারসাল এরিথ্‌মেটিক'। এই শাস্ত্রের 'বীজগণিতম্' নামকরণ করেন একজন ভারতীয় গণিত এবং জ্যোতির্বিদ দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য দ্বাদশ শতাব্দীতে। এই নামকরণ থেকে বোঝা যায় যে তিনি সত্যই উপলব্ধি করেছিলেন যে এই শাস্ত্রটি গণিতের মূল বা বীজ। তিনি একটি সূত্রে বলেছেন—

দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তসংজ্ঞং ;
ব্যক্তং পাটীগণিতম্ অব্যক্তং বীজগণিতম্ ॥

28/4/2/1B শ্রীমোহন লেন, কলি-26.

বেলা এখন বারোটা। সূর্য ডুবছে, তারমানে আমরা ঠিক দক্ষিণ মেরুতে।
আমি ক্যাপ্টেন নিমো, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ দক্ষিণ মেরুর নক্সই ডিগ্রীতে প্রথম পৌঁছলাম।
বিদায়, বিদায় হে সূর্য, এবার তোমার বিশ্রামের পালা। দিনের অবসান হল। ছ'মাস অন্তহীন রাত্রি নেমে আসুক আমার নব আবিষ্কৃত এই রাজ্যের উপর।
ট্যাঙ্কে জল ভরার পর নটিলাস ডুব দিল। যাত্রা শুরু হল সোজা উত্তরে।
তখন রাত্রি তিনটে। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় দুলে উঠলো নটিলাস।
কী হল! কোনও দুর্ঘটনা?
ইস্, কী বিশ্রীভাবে হেলে রয়েছে নটিলাস!
এবার সত্যিই দুর্ঘটনা ঘটেছে অধ্যাপক। বিশাল একটা বরফের পাহাড় উল্টে পড়েছে নটিলাসের উপর। এখন ভিতরের সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে ভেসে ওঠার চেষ্টা করা হচ্ছে।
যাক, আমরা ভেসে উঠেছি, কিন্তু চারদিকে দেখছি বরফের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। নটিলাস বরফের স্তূপের ওপরে পড়েছে এবার।

খুদে বৈজ্ঞানিক

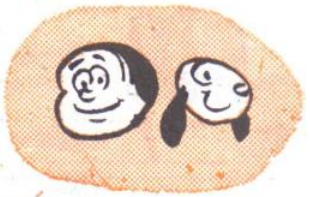

দিলীপ দাস

ভউস্ঃ
!
এঃ হে!
ফ্লেচ্চো!
না-না, এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এটা একটা কেমিক্যাল রিয়্যাক্শান, কোন দুর্ঘটনা নয়—
—এবার এই হাইড্রক্লোরিক এ্যাসিড, কয়েক ফোঁটা দিয়ে দেখি কি হয়—
কিছু একটা ঘটার আগেই আমি সরে পড়ি!
বুম্
এ কি রে, তুই এভাবে বেসখেকে?
অঁক!
মনে হচ্ছে এটা তোর সেই কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্টেরই কোন রিয়াক্শান?
স্ল্যাঁৎস্!
নাঃ, এ দেশে বৈজ্ঞানিকদের কোন প্রেস্টিজ নেই!
ফ্লেচ্চো-ও-ও-ও

বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র : লেখা ও ছবি / দিলীপ দাস

গবেষণার কাজে জগদীশচন্দ্রকে বারবার শত শত বিরুদ্ধবাদীর বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

মিঃ বোস, আপনি ফিজিক্স-এর লোক হয়ে কেন আবার ফিজিওলজির মধ্যে নাক গলাচ্ছেন?

কেন? এতে আমার ভুল বা অন্যায়টা দেখলেন কোথায়?

না তা নয়। বলছিলাম আপনি আপনার লাইনে থাকলেই ভাল করতেন

এই অস্বীকারের জন্য রয়াল সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধটি ওরা সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দিল না

বুঝেছি। তুমি আমাদের লিলিয়ান সোসাইটিতে এসে পরীক্ষাগুলো দেখাও

আমরা তোমার প্রবন্ধ প্রকাশ করব। আর ঐ বিরুদ্ধবাদীদেরও সভায় ডাকব। তখন ওদের বক্তব্য শোনা যাবে

আবার পরীক্ষা। এবার স্থান লিলিয়ান সোসাইটি। অবাক বিস্ময়ে সবাই দেখল উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের সংকোচন প্রসারণ। আবার জগদীশচন্দ্রের জয় ঘোষিত হল

সার্থক আপনার গবেষণা

অপূর্ব! আর আমাদের দ্বিমতের কোন কারণ নেই। এই আবিষ্কার একমাত্র ভারতীয়ের পক্ষেই সম্ভব।

এর কিছুদিন পর লিলিয়ান সোসাইটির সম্পাদকের একটা চিঠি পেয়ে জগদীশচন্দ্র হতবাক

এখানেও চুরি! আমার আবিষ্কারটি এক শরীরবিজ্ঞানী নাকি নিজের নামে চালাবার চেষ্টা করছে!

সব শুনে অধ্যাপক হাক্সলেস্ ও ভাইনস এক মুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে ঐ জাল আবেদন নাকচ করে দিলেন

না, এ হতে পারে না। এ দাবী পেশ করার বহু পূর্বেই রয়াল সোসাইটিতে প্রদত্ত মিঃ বোসের প্রবন্ধের কপিটি আমরা দেখেছিলাম। নানা কারণে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় নি। ওখান থেকেই উক্ত বৈজ্ঞানিক কৌশলে অংশ বিশেষ চুরি করেছে। এ বৈজ্ঞানিক জাল। আসল বৈজ্ঞানিক মিঃ বোস।

রসায়নে কি ও কেন?

অমরনাথ রায়

(1) মুক্ত শৃঙ্খল জৈব যৌগগুলিকে 'অ্যালিফ্যাটিক যৌগ' বলা হয় কেন?

প্রকৃতিতে স্নেহজাতীয় পদার্থের (তেল, ঘি প্রভৃতি) মধ্যে মুক্ত শৃঙ্খল জৈব যৌগগুলিকে পাওয়া যায় বলে এদের স্নেহজ জৈব যৌগ বা 'অ্যালফ্যাটিক জৈব যৌগ' বলা হয়।

(2) 'মিথেন' যৌগের অপর নাম 'মার্স গ্যাস' রাখা হয়েছে কেন?

ডোবা, পুকুর অন্যান্য আবদ্ধ জলাশয়ে উদ্ভিদের ডাল লতা-পাতা পচে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। আবদ্ধ জলাভূমি থেকে উদ্ভূত হয় বলে মিথেনের অপর নাম 'মার্স গ্যাস'।

(3) 'ক্লোরোফর্ম' কোন্ কোন্ কাজে লাগে?

অস্ত্রোপচরের আগে রোগীকে অচৈতন্য করতে চেতনা নাশক ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় ক্লোরোফর্ম। শিল্পক্ষেত্রে তেল, রজন, প্লাস্টিক, নিকোটিন ইত্যাদির দ্রাবক হিসাবে ক্লোরোফর্ম ব্যবহৃত হয়। এ ভিন্ন ড্রাই-ক্লিনিং-এ এবং ফ্লুওরোকার্বন প্রস্তুতিতে ক্লোরোফর্ম ব্যবহৃত হয়।

(4) C_6H_5OH আণবিক সংকেতযুক্ত যৌগকে কি কি নামে অভিহিত করা যায়।

যৌগটিকে মনোহাইড্রক্সি বেঞ্জিন, ফেনল ও কার্বলিক অ্যাসিডের মধ্যে যে কোনও একটি নামে অভিহিত করা যায়।

(5) কৃষিকাজে রাসায়ানিক সার হিসাবে এমন একটি যৌগ, যা পাওয়া যায় প্রাণীদের মূত্রে। ঐ যৌগটি কি ভাবে তৈরী করা হয়?

যৌগটির নাম 'ইউরিয়া'। যৌগটি পাওয়া যায় প্রাণীদের মূত্রে। বর্তমানে প্রধানতঃ অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে 'ইউরিয়া' তৈরী করা হয়। এই যৌগ দুটি উচ্চতাপ ও চাপে প্রথমে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট-এ পরিণত হয়। অ্যামোনিয়াম কার্বামেট থেকে জল বের করে দিলেই পাওয়া যায় 'ইউরিয়া'।

(6) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের অপর নাম 'অয়েল অফ ভিট্রিয়ল' রাখা হয়েছে কেন?

প্রাচীনকালে সবুজ ভিট্রিয়ল বা হীরাকসকে (ফেরাস সালফেট, Fe_2O_4) পাতিত করে এবং উৎপন্ন সালফার ট্রাই অক্সাইড গ্যাসকে জলে শোষিত করে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা হতো। তাই গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের অপর নাম রাখা হয়েছে 'অয়েল অফ ভিট্রিয়ল'।

(7) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডকে 'খনিজ অ্যাসিড' আখ্যা দেওয়া হয়েছে কেন?

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরী করা হয় 'সোডিয়াম ক্লোরাইড' নামক খনিজ পদার্থ থেকে, সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করা হয়, খনিজ পদার্থ 'সালফার থেকে এবং নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী করা হয় সোরা ও পটাসিয়াম নাইট্রেট নামক খনিজ পদার্থ থেকে। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থেকে এই অ্যাসিডগুলি তৈরী করা হয় বলে এগুলিকে 'খনিজ অ্যাসিড' আখ্যা দেওরা হয়েছে।

(8) 'মোলার আয়তন' বলতে কি বোঝ?

এক গ্রাম অনু পরিমাণ যে কোন গ্যাস যে আয়তন অধিকার করে থাকে, তাকে গ্যাসটির গ্রাম-আণবিক আয়তন বা 'মোলার আয়তন' বলে। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল যে, সব গ্যাসের ক্ষেত্রেই প্রমাণ উষ্ণতা ও চাপে এই আয়তনের পরিমাণ 22·4 লিটার।

(9) 28 গ্রাম নাইট্রোজেনকে 'এক মৌল' নাইট্রোজেন বলা হয় কেন?

কোন পদার্থের আণবিক গুরুত্বকে গ্রামে প্রকাশ করলে তাকে পদার্থটির গ্রাম আণবিক গুরুত্ব বা গ্রাম অনু বা আরও সংক্ষেপে 'মোল' বলা হয়। যেহেতু নাইট্রোজেনের গ্রাম আণবিক গুরুত্ব 28 গ্রাম, সেইহেতু 28 গ্রাম নাইট্রোজেনকে 'এক মোল' নাইট্রোজেন বলা হয়।

(10) বিদ্যুৎবাহী থাম সংযুক্ত তড়িৎবাহী তামার তার কিছুদিনের মধ্যে আপন ঔজ্জ্বল্য হারায় কেন?

জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে বাতাসের সঙ্গে বিক্রীয়া হওয়ার ফলে কপারের উপর কিউপ্রাস অক্সাইডের একটি পাতলা আবরণ পড়ে। , এর জন্যেই কপারের তৈরি তার-গুলির ঔজ্জ্বল্য শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়।

(11) কি ভাবে প্রমান করবে যে অ্যামোনিয়া যৌগে হাইড্রোজেন আছে?

অ্যামোনিয়াকে অক্সিজেনের পরিবেশে জ্বালালে অর্থাৎ দহন করলে অ্যামোনিয়া হলুদ শিখায় জ্বলে। বিক্রিয়ার

ফলে জল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন জল অনার্দ্র কপার সালফেট এর (সাদা রঙের) উপর ফেললে জলের প্রভাবে সাদা রঙের ঐ অনার্দ্র যৌগটি নীল বর্ণ ধারণ করে। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে অ্যামোনিয়ায় হাইড্রোজেন আছে।

(12) ক্ষারক ও ক্ষার এর মধ্যে প্রভেদ কি ?

সাধারণভাবে আমরা ধাতব অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইড-গুলিকে ক্ষারক আখ্যা দিয়ে থাকি! এই সংজ্ঞানুসারে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO), সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ($NaOH$) ইত্যাদি যৌগগুলি ক্ষারক পর্যায়ভুক্ত। অপর-পক্ষে জলে দ্রাব্য ক্ষারকীয় ধর্মবিশিষ্ট ধাতব, হাইড্রক্সাইড-গুলিকে ক্ষার আখ্যা দেওয়া হয়। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ($NaOH$) ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Ca(OH)_2$] প্রভৃতি যৌগগুলি ক্ষার।

(13) 'ফেনপথ্যালিন' এমন একটি পদার্থ, যা বর্ণের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রশমন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার সঠিক মূহূর্তটিকে নির্দেশ করে।—এখন বল, অ্যাসিড দ্রবণে, ক্ষার দ্রবনে ও প্রশম দ্রবণে ফেনপথ্যালিনের রং কেমন হবে ?

অ্যাসিড দ্রবণে ফেনপথ্যালিনের রং থাকবে না, প্রশম দ্রবণেও তাই, অর্থাৎ এই দুই দ্রবণেও তাই, অর্থাৎ এই দুই দ্রবণে ফেনপথ্যালিন হবে বর্ণহীন কিন্তু ক্ষার দ্রবণে ফেনপথ্যালিন হবে লাল রঙের।

(14) কলিচূণ [$Ca(OH)_2$] গরম জলের চেয়ে ঠাণ্ডা জলে বেশী দ্রাব্য কেন ?

কলিচুনের দ্রাব্যতা উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায় বলে কলিচুন গরম জলের চেয়ে ঠাণ্ডা জলে বেশী দ্রাব্য।

(15) জমানো কার্বন ডাই অক্সাইড ও ইথার 4 1 অনুপাতে নেওয়া হলো। ঐ মিশ্রণটির কি নাম দেওয়া যাবে ? ঐ মিশ্রণের উষ্ণতাই বা সেলসিয়াস স্কেলে কত হবে ?

ঐ মিশ্রণটিকে বলা যাবে হিম মিশ্রণ এবং মিশ্রণের উষ্ণতা হবে—77° সেলসিয়াস।

নিউট্রাফিক, খড়্গপুর

• মজার ছবি •   •প্রনব হোড়

1984-র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

জীবন বিজ্ঞানের আলোচনা

তারকমোহন দাস

প্রতি বছরের মত এবারও মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে জীবন বিজ্ঞানের পরীক্ষার্থীদের কাজে লাগতে পারে এমন কিছু বিষয় এখানে আলোচনা করা হল।

জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষায় ভাল ফল করতে হলে প্রথমে আলোচ্য বিষয়টি নিজে ভাল করে বুঝতে হবে তারপর অল্প কথায় সঠিক উত্তরটি দিতে হবে। বিগত কয়েক বছর ধরে প্রশ্নপত্র এমন ভাবে করা হচ্ছে যা পড়ে মনে হয় যারা বিষয়টি ভাল ভাবে বুঝেছে তাদের ভাল ভাবে পাশ করবার কোন অসুবিধা হবে না, হবার কথা নয়। প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও দ্ব্যর্থহীন হওয়া দরকার এজন্য একাধিক পাঠ্যপুস্তক পড়ে মূল বিষয়টি প্রথমে ভালভাবে বোঝা দরকার। কোনও বই-এ কোন বিষয় যদি যথেষ্ট সরল করে না লেখা থাকে তাহলে একাধিক বই পড়লে এবং বিভিন্ন দিক থেকে বিষয়টি আলোচনা করলে সে অসুবিধা দূর হতে পারে। না বুঝে কোন কিছু মুখস্থ করা নিছক পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। সকল ভাষায় সঠিকভাবে মূল বিষয়টি জানার মধ্যেই বিজ্ঞান শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করছে। মূল বিষয়টি না জেনে, না বুঝে যদি কিছু সংজ্ঞা বা প্রশ্ন উত্তর জাতীয় কিছু নোট বই অথবা জটিল কিছু বিষয় মুখস্থ করতে যাও তাহলে ফল মারাত্মক হতে পারে। ঠিক সেই কারণেই বেছে বেছে কয়েকটি বিষয় না পড়ে সিলেবাসের অন্তর্গত সকল বিষয়গুলিই পড়া দরকার। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জীবন বিজ্ঞানের যে গাইড-লাইন দিয়েছে সেটিও পুঙ্খানুপুঙ্খ করে দেখা দরকার। একথা বলবার কারণ এই গত তিন চার বছর ধরে জীবন বিজ্ঞানের যা প্রশ্ন করা হচ্ছে তা ঐ গাইড-লাইন ধরেই করা হচ্ছে। অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তকের প্রথমেই ঐ গাইড লাইন দেওয়া আছে।

ছাত্রছাত্রীদের এই সিলেবাস সম্পর্কে আর একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। জীবন বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিষয়টি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী অবধি পড়ানো হয়ে থাকে। সুতরাং মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য শুধু নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাস ধরে পড়লেই চলবে না, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বইগুলিও একবার দেখে নিতে হবে। সব সময়ই প্রশ্নপত্রে এমন কিছু প্রশ্ন থাকে যা ষষ্ঠ, সপ্তম অথবা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ানো হয়ে গেছে। যেমন কোষের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে। কলা সম্পর্কে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ বৈশিষ্ট্য ও আচরণ সম্পর্কে। প্রশ্নগুলি কিন্তু খুবই সোজা থাকে কিন্তু পড়ে না যাওয়ার জন্য সঠিক উত্তরটা দিতে পার না। সুতরাং পরীক্ষায় যারা ভাল করতে চাও তারা ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পুরনো বইগুলিও একবার দেখে নিও।

কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হলে প্রশ্নটিও তোমাদের আগে সঠিকভাবে বোঝা দরকার। সেই জন্য আমাদের বিশেষ অনুরোধ বাংলায় লেখা প্রশ্নপত্রটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীতে লেখা প্রশ্নপত্রটিও তোমরা অবশ্যই একবার মিলিয়ে দেখে নিও। তাতে প্রশ্নগুলি বোঝবার সুবিধা হবে, অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। বাংলা প্রশ্নপত্রে অনেক সময় এমন অনেক বাংলা বৈজ্ঞানিক শব্দ আসে যা তোমরা যে পাঠ্যপুস্তকটি পড়ছ তাতে নেই। কয়েক বছর আগে প্রশ্ন এসেছিল সঞ্চালন ও চলনে প্রভেদ কি? অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে আছে চলন ও গমনের কথা, সঞ্চালন শব্দটি কোথাও নেই, তাই সঠিক উত্তরটি জানা সত্ত্বেও অধিকাংশ পরীক্ষার্থী ঐ প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে নি। কিন্তু যারা ইংরাজীতে লেখা প্রশ্নপত্রে movement শব্দটি দেখে নিয়েছিল তাদের উত্তর লিখতে কোন অসুবিধা হয় নি।

জীবন বিজ্ঞানের আর একটি ভাষা হল 'ছবি'। আমাদের বিশেষ অনুরোধ হল পরীক্ষার্থীরা যখনই সুযোগ পাবে তখনই ভাষা ছাড়াও ছবি এঁকে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করবে। যেখানে ছবি আঁকার নির্দেশ নেই সেখানেও আঁকা উচিত। ভাষার যদি কিছু ত্রুটি থাকে ছবি সেটা সংশোধন করবে। পরীক্ষককে যদি তুমি ছবি এঁকে বোঝাতে পার বিষয়টি তুমি ঠিক জান তাহলে অবশ্যই তুমি কিছু নম্বর আশা করতে পার। প্রতিটি ছবি অবশ্যই সঠিক ভাবে লেবেল করতে হবে। বিজ্ঞানে লেবেল ছাড়া ছবির কোনই মূল্য নেই। পার্থক্য বোঝাবার জন্য রঙীন সাইন পেন ব্যবহার করতে পার।

পরীক্ষার্থীদের কাছে একটি আনন্দের কথা — গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে জীবন বিজ্ঞানের প্রশ্ন খুবই সহজ হচ্ছে। এই সহজ হবার জন্যই অনেকে আবার মুসকিলে পড়েছিল, কেননা বেছে বেছে তারা জটিল বিষয়গুলিই মুখস্থ করে গিয়েছিল। সেই জন্য গাইড লাইনে যা লেখা আছে সেই মূল বিষয়গুলি সম্পর্কেই তোমাদের পরিস্কার জ্ঞান থাকা দরকার। কোনো বাদ, বাছাই চলবে না। আশাকরা যায় এবছরও সহজ প্রশ্নই আসবে। মন দিয়ে মূল বিষয়গুলি পরিস্কার ভাবে বুঝে নিলে জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষায় ভাল ফল করা আদৌ কঠিন নয়।

---

24 A, সার্কুলার গার্ডেন রোড, কলি-23

ইউরিয়া

প্রভাস চন্দ্র দাস

কৃষি-প্রধান পশ্চিমবাংলায় চাষবাস এখন বারোমাসের কাজ। জমিতে ক্রমাগত চাষ, ভূমিক্ষয় ও অন্যান্য কারণে মৃত্তিকাতে গাছের খাদ্য উপাদানগুলির ঘাটতি পড়ে ও মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস পায়। সুতরাং উদ্ভিদের চাহিদা মেটানোর জন্য ও মৃত্তিকার উর্বরতা বজায় রাখা এবং এর উন্নতির জন্য যে সব জৈব ও রাসায়নিক পদার্থ আলাদা-ভাবে মৃত্তিকায় প্রয়োগ করা হয়, তাকেই সার বলে। এক কথায় গাছের কৃত্রিম খাদ্যকেই সার বলা হয়। সার প্রধানতঃ দুই প্রকারের ; যথা—

(ক) **জৈব সার ঃ** জীবজাত সারকে জৈব সার বলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবশিষ্টাংশ দিয়ে জৈব সার তৈরী করা হয়।

(খ) **অজৈব সার ঃ** বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান থেকে সম্পূর্ণ কৃত্রিম পদ্ধতিতে কলকারখানায় যে সার তৈরী হয় তাকে অজৈব সার বা রাসায়নিক সার বলে।

ইউরিয়া একটি জনপ্রিয় নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সার। এর রাসায়নিক সংকেত $Co(NH_2)_2$। এতে শতকরা 44-46 ভাগ জৈব নাইট্রোজেন থাকে। তাই অন্যান্য নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সারের চেয়ে ইউরিয়া তুলনামূলক হিসাবে দামে সস্তা ও পরিমানেও কম লাগে। তার ফলে পরিবহন, মজুত ও ছড়াবার খরচও অন্যান্য নাইট্রোজেন ঘটিত সারের চেয়ে কম। ইউরিয়ার রং সাদা ও দেখতে সাবু দানার মত এবং দানা ঝুরঝুরে। এই সার খুব বেশী জলগ্রাহী। তাই এই সার সংরক্ষন করা বেশ অসুবিধাজনক। এই সার জলে খুবই দ্রবণীয় ; তাই নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। ইউরিয়ার সাথে 5-6 গুণ শুকনো মাটি মিশিয়ে 48 ঘন্টা রাখার পর নীচু ধান জমিতে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এই সারের অম্ল সমতুল্য 80, অর্থাৎ 100 কেজি. ইউরিয়া প্রয়োগ করলে যে পরিমাণ অম্লতা সৃষ্টি হয়, তাকে দূর করতে 80 কেজি. ক্যালসিয়াম কার্বনেট প্রয়োগ করতে হবে।

ইউরিয়া একটি জৈব রাসায়নিক সার। ইউরিয়া জমিতে প্রয়োগ করলে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি দেখা যায়। তার ফলে গাছের শোষণের জন্য নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াম ও নাইট্রেট আকারে পাওয়া যায়। এবং এরূপ পরিবর্তন হতে 7-14 দিন সময় লাগে।

$$Co(NH_2)_2 + 2H_2O \rightarrow (NH_4)_2Co_3$$ (অ্যামোনিয়াম কার্বনেট)

$$(NH_4)_2Co_3 + 3o_2 \rightarrow HNo_2 + 3H_2O + Co_2$$

$$2HNo_2 + 2O_2 \rightarrow 2HNo_3$$

(নাইট্রাইট নাইট্রোজেন + অক্সিজেন) → নাইট্রেট
নাইট্রোজেন

সাধারণতঃ 'ইউরিয়েজ' নামক জীবাণুর সাহায্যে ইউরিয়া অ্যামোনিয়াম কার্বনেটে রূপান্তরিত হয়। এরপর মৃত্তিকায় নিম্নলিখিত বিক্রিয়া ঘটে। যথা ঃ

$$Ca\ \boxed{\text{ক্লেকনা}} + (NH_4)_2Co_3 \rightarrow \boxed{\text{ক্লেকনা}}\ NH_4^+ + CaCo_3$$

ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCo_3$) অদ্রবণীয় বলে এর অপচয় কম হয়। তার ফলে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে অন্যান্য নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সারের তুলনায় মৃত্তিকার অম্লতা কম পরিমাণে বাড়ে। জলা জমিতে এই সার প্রয়োগ করলে নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় ইউরিয়া নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য সার প্রয়োগের তিন-চারদিন পর্যন্ত নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় এই সারের অপচয় হয়।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ

উচ্চ চাপে (200 বায়বীয় চাপ) অ্যামোনিয়ার সাথে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে ইউরিয়া প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট তৈরী হয়। ইহা অস্থির পদার্থ। চাপ কমালে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট থেকে দু' অণু জল চলে যায় এবং এর ফলে ইউরিয়া প্রস্তুত হয়।

বিক্রিয়া ঃ

$$2NH_6 + Co_2 \rightarrow NH_4CooNH_2 + H_2O$$

অ্যামোনিয়া + কার্বন ডাই-অক্সাইড → অ্যামোনিয়াম কার্বনেট + জল।

$$NH_4CooNH_2 \rightleftharpoons Co(NH_2)_2 + H_2O$$

দ্রবনটিকে 'ভ্যাকাম এভাপরেটর'-এর সাহায্যে ঘনীভূত করা হয়। পরে বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুষ্ক করে নেওয়া হয়।

ব্যবহার ঃ

সব রকম মাটিতেই এবং সব রকম ফসলের জন্য এ সার বিশেষ উপযোগী। বীজবপন বা চারা রোপনের সময় অথবা চাপান সার হিসেবে এই সার প্রয়োগ করা চলে। তবে বীজের সাথে বা বীজের খুব কাছে এই সার প্রয়োগ করা উচিৎ নয়। মাটিতে ছড়ানো ছাড়াও ইউরিয়া জলে গুলে গাছের পাতায় প্রয়োগ করা যায়। প্রয়োজনে ধান, গম, ভুট্টা, আখে ও পাটে শতকরা 2 ভাগ হিসাবে ইউরিয়া গুলে ছেটানো যায়। গাছের বয়স চার-পাঁচ সপ্তাহ হলে ইউরিয়া স্প্রে করা যায়। ইউরিয়ার সাথে কীটনাশক ও রোগনাশক ঔষধ মিশিয়ে একসাথে স্প্রে করা যায়। এতে একসাথে অনেকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, খামারের গবাদি পশু তথা দুগ্ধবতী গাভীকে অল্প পরিমাণে ইউরিয়া খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বড়বৈনান, বর্ধমান

বিজ্ঞানভিত্তিক ধারাবাহিক উপন্যাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবুজ বনের গান

॥ নয় ॥

স্টপ্ ইট! স্টপ্ ইট!

একটু পরেই বুঝতে পারলুম ওটা এক স্পটলাইট। প্রিয়বর্ধনকে সেকথা বললে সে কিছুতেই বিশ্বাস করল না। ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'ডাইনির দ্বীপে এমন আলো দেখা যায় শুনেছি। জয়ন্ত, চলো আমরা এ গুহা থেকে পালিয়ে পাহাড়ের পেছনে কোথাও লুকিয়ে পড়ি। ডাইনিটা ঠিকই আমাদের গন্ধ পেয়ে যাবে। শুনেছি, সে নাকি জলজ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে খায়।'

সে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। আমার কোনো কথা আমল দিল না। বরং সে পালিয়ে নিরাপদ জায়গায় যাবার জন্য আমার হাত ধরে টানাটানি শুরু করল।

লোকটা এত কুসংস্কারের ডেঁপো, ভাবা যায় না! আলোটা যখন বৈদ্যুতিক, তখন আলোর মালিক অবশ্যই সভ্য জগতের মানুষ। শত্রু-মিত্র যেই হোক, মানুষ তো বটে। তাছাড়া এমনও হতে পারে, কোনো মোটরবোট অথবা জাহাজ এসে এই দ্বীপের কাছে ভিড়েছে। উদ্ধার পাওয়ার এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।

নিজেকে ওর হাত থেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকলুম। প্রিয়বর্ধন পেছনে চাপা গলায় আমাকে যাচ্ছেতাই গালমন্দ দিতে লাগল। আতঙ্কে লোকটার মাথার গণ্ডগোল হয়ে গেছে হয়তো।

অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হতে পারত, কিন্তু স্পট লাইটটা চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। তাই বারবার হোঁচট খাচ্ছিলুম পাথরে। আছাড় খেতেও হল বার কতক। শেষ এমন আছাড় খেলুম যে গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচের ঝোপঝাড়ে পড়ে পোশাক ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হল। কাঁটায় শরীরের অনেক জায়গা ছড়ে গেল। জ্বালা করছিল ভীষণ।

কিন্তু আমি মরীয়া। ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে দেখি, আলোটা যত কাছে ভেবেছিলুম, তত কাছে নয়। একটা পাথরের ওপর আলোটা রাখা আছে। কিন্তু জনমানুষ নেই। থমকে দাঁড়াতে হল। ওটা কি সত্যি স্পটলাইট?

হ্যাঁ, তাতে তো কোনো ভুল নেই। কারণ আলোর ছটা একটা দিকেই পড়েছে—যেদিক থেকে যাচ্ছি, সেদিকে। আমি এখন কিছুটা বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছি বলে আলোর নাগালে নেই। এবার সাড়া নেওয়া উচিত ভেবে যেই ঠোঁট ফাঁক করেছি, সেই মুহূর্তে হেঁড়ে গলায় কেউ গান গেয়ে উঠল।

তারপর গানটা দুকলি গাওয়া হয়েছে, কেউ তেমনি দুর্বোধ্য ভাষায় তেড়ে ধমক দিল। সঙ্গে সঙ্গে গানটা থেমে গেল। তারপর অনেকগুলো গলায় কারা হেসে উঠল।

তাহলে আলোটার ওপাশে পাথরের পেছনে একদঙ্গল মানুষ আছে। কারা তারা? একটু দোনামনা হচ্ছিল আমার। ক্যারিবো কিংবা কিয়াংয়ের দলবল নয় তো? গিয়ে ওদের পাল্লায় পড়লে আমার ভাগ্য আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

প্রায় বুকে ভর করে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে পাথরটার পেছনে গেলুম। তারপর কান পেতে রইলুম। ওরা চাপা গলায় গলায় কথা বলছে। একবর্ণও বুঝতে পারছিনা। পাথরের ফাঁক দিয়ে ওদের আবছা মূর্তিগুলো চোখে পড়ল। ওরা ছায়ায় হাত পা ছড়িয়ে কেউ বসে বা শুয়ে আছে। কী করা উচিত ভাবছি, আর দরদর করে ঘামছি উত্তেজনায়।

হঠাৎ পেছনে অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলুম। ঝটপট ঘুরে বসতেই প্রিয়বর্ধন ফিসফিস করে বলল, 'চুপ!'

লোকটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ভেবেছিলুম ডাইনির ভয়ে লেজ তুলে পালিয়ে গেছে গুহা থেকে। অথচ সে দিব্যি আমার পেছন পেছন চুপিচুপি এসে হাজির। ঘাপটি মেরে বসে কিছুক্ষণ কান পেতে কথাবার্তা শোনার পর আমার কানে কানে ফিসফিস করে

বলল, 'শয়তান ক্যারিবো!

তাহলে ঠিকই অনুমান করেছিলুম। ভাগ্যিস, হুড়মুড় করে ওদের সামনে গিয়ে হাজির হইনি! আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা শোনার পর প্রিয়বর্ধন আমাকে তনেকটা দূরে নিয়ে গেল। হ্রদের ধারে হাঁটতে হাঁটতে চাপা গলায় বলল, শাপে বর হয়েছে, জয়ন্ত! ক্যারিবো মোটরবোট নিয়ে এখানে হাজির হয়েছে! ঠিক বুঝতে পারলুম না কী একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। যতদূর মনে হল, ওরা কিওটা দ্বীপের হদিস করতে পারছে না। তাই হতাশ হয়ে ঢকঢক করে মদ গিলে মাতাল হচ্ছে।'

বললুম, 'কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

প্রিয়বর্ধন বলল, 'স্টেনগানটা থাকলে ক্যারিবো আর তার তিনজন সঙ্গীকে ওখানেই যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিতুম। তারপর দেবী মূর্তিটা উদ্ধার করে ওর মোটর-বোট নিয়ে কিওটা অভিযানে পাড়ি জমাতুম! যাক গে, চুপচাপ এস। কী করি, দেখ না!'

হ্রদ ঘুরে পুবদিকে গিয়ে ক্যারিবো তার দলবলকে এড়িয়ে প্রিয়বর্ধন আমাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেল। তখনও টের পাইনি ওর উদ্দেশ্য। একটু পরে সেটা জানলুম।

আমরা এখন রাজা হতে চলেছি

এদিকটায় সমুদ্রের খাড়ি। খাড়ির এককোণে মোটর-বোটটা আবিষ্কার করতে দেরি হল না। মোটরবোটে কেউ পাহারা দিচ্ছে না। প্রিয়বর্ধন বলল, 'স্টার্ট দেওয়ার উপায় নেই। ক্যারিবোর পকেটে চাবি। কাজেই এসো, এটাকে আমরা কোথাও লুকিয়ে রেখে আসি। ওটার মধ্যে বৈঠা আছে। অসুবিধে হবে না। শিগগির!'

খাড়ির জলটা অপেক্ষাকৃত শান্ত। দক্ষিণ ঘুরে আমরা মোটরবোটটা সেই গুহাওয়ালা পাহাড়ের পেছন দিকে নিয়ে গেলুম। তারপর সংকীর্ণ আরেকটা খাড়ির ভেতর পাহাড়ের তলার দিকে চওড়া ফাটলের ভেতর লুকিয়ে রাখলুম। প্রিয়বর্ধন মোটরবোটের অন্ধিসন্ধি খুঁজে নিরাশ হয়ে বলল, 'ব্যাটারা বৈঠাগুলো বাদে কিচ্ছু রেখে যায় নি। না অস্ত্রশস্ত্র, না খাবার দাবার। মহাধড়িবাজ লোক ওই ক্যারিবো।'

অন্ধকারে এবার আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়েছে। বাঁদিকে পাহাড় ভাঙা চাঙড়ের ওপর দিয়ে উঠে যেতে অসুবিধা হল না। পাহাড়টা শ দুয়েক ফুটের বেশি উঁচু নয় এখানে পেছন দিকটা চমৎকার গড়ানে। আবার হ্রদের দিকে পৌঁছে প্রিয়বর্ধন একটা প্ল্যান বাৎলে দিল।

প্ল্যানটা মারাত্মক। কিন্তু প্রিয়বর্ধনের বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর এখন আমার প্রচুর আস্থা জন্মে গেছে। স্পটলাইটটা তেমনি জ্বলছে। আমি চুপিচুপি তখনকার মতো ওটার কাছে এগিয়ে গেলুম। প্রিয়বর্ধন গেল বাঁদিকে হ্রদের কিনারা দিয়ে ঘুরে।

যে পাথরে আলোটা রাখা আছে, তার আড়ালে বসে রইলুম। ক্যারিবোরা এখন চুপচাপ। তাদের নাক ডাকা শুরু হতে আরও ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হল। তার-পর হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচ অফ করে দিলুম এবং স্পটলাইটটা বাগিয়ে ফেললুম।

তারপর গুঁড়ি মেরে অন্য পাশে গিয়ে প্রিয়বর্ধনের শিসের অপেক্ষা করতে হল। একটু পরেই সেই শিস কানে এল। পাল্টা শিস দিলুম। তখন প্রিয়বর্ধন এসে হাজির হল। ফিসফিস করে বলল, 'মদের নেশায় কাহিল ব্যাটারা। আগে এই মালপত্রগুলো ধরো। তার পর অন্য কথা।'

জিগ্যেস করলুম, 'চাবি হাতাতে পেরেছ তো?'

'হুঁউ। অনেক কিছুই। আমরা এখন রাজা হতে চলেছি।'.....

তখন রাত এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট। আমাদের মোটরবোট ছুটেছে অকূল সমুদ্রে। প্রিয়বর্ধন যা সব হাতিয়ে এসেছে, তা হল: একদা স্টেনগান, একটা কিটব্যাগ, কিটব্যাগের ভেতর শ তিনেক প্যাকেটকরা কার্তুজ আর সেই চুরি যাওয়া দেবীমূর্তি। হ্যাঁ, আরও একটা জিনিস হাতিয়ে এনেছে প্রিয়বর্ধন। একটা খাদ্য দ্রব্যের প্রকাণ্ড প্যাকেট। তার ভেতর জ্যাম, জেলি, সসেজ, ফ্রায়েড কিশের টুকরো, পাঁউরুটি পর্যন্ত। প্রিয়বর্ধন তবু পস্তাচ্ছিল। 'কেন যে ছাই ওদের কফির ফ্লাস্কটা নিয়ে এলুম না। আহা, সমুদ্রের বুকে কফি খাওয়ার চেয়ে আনন্দ আর কিছুতে নেই!'

এক সময় জিগ্যেস করলুম, 'কিন্তু এভাবে আমরা যাচ্ছি কোথায়? একসময় জ্বালানী ফুরিয়ে যাবে, তখন মোটরবোট অচল হয়ে যাবে না?'

প্রিয়বর্ধনের আনন্দের ঘোরটা একথায় যেন কেটে গেল। ঝুঁকে পড়ে মোটরবোটের কম্পাস দেখে নিয়ে বলল, 'সর্বনাশ! উত্তরে যেতে গিয়ে যে দক্ষিণে চলেছি! জ্বালানী যা আছে, আর অন্তত ঘণ্টা তিনেক চলবে।'

সে মোটরবোটের মুখ ঘুরিয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, সমুদ্রের এই এলাকায় তীব্র স্রোত আর ঢেউগুলোও রুখে দাঁড়াচ্ছে। যতবার মোড় নেওয়ার চেষ্টা করে মোটর বোট উল্টে যাবার তালে থাকে। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে প্রিয়বর্ধন বলল, 'যেখানে খুশি যাক্। আর কিছু করার নেই।'

আসন্ন বিপদের মুখে আমার বুদ্ধি খুলে গেল। স্পটলাইটটা জ্বেলে দিয়ে বললুম, 'প্রিয়বর্ধন, তুমি বল-ছিলে মূর্তিটার ভেতর কিওটা দ্বীপের যাবার নক্সা আছে। একবার সেটা দেখলে হত না? যদি জ্বালানী থাকতে-থাকতেই আমরা সেখানে পৌঁছে যেতে পারতুম।'

প্রিয়বর্ধন মুখ বেজার করে বলল, 'দেখতে পারো। তবে ক্যারিবোর মতো ঘুঘু যখন হদিশ করতে পারে নি, তুমি পারবে বলে মনে হয় না।'

মূর্তিটা সত্যি অপরূপ। অবিকল আমাদের দেবী সরস্বতীর মতো। হাতে বীণাও রয়েছে। মূর্তিটা পরীক্ষা করে উল্টেপাল্টে দেখেও বুঝতে পারছিলুমনা, ওর ভেতরে কিছু থাকতে পারে কিনা। সাবধানে মোচড় দিয়ে দেখলুমও প্যাঁচ থাকলে যদি খোলা যায়। কিন্তু মূর্তিটা নিরেট।

হঠাৎ চোখ পড়ল ওটার মাথার পেছনে। একটা পেরেকের মতো খোঁচা বেরিয়ে আছে। ওটা যেই চাপ দিয়েছি, তলার দিকের একটা জায়গা ঢাকনার মতো খুলে গেল। আর ঠকাস করে কী একটা পড়ল নিচের পাটাতনে। পুড়িয়ে দেখি, একটা কাস্তে।

অবিকল একই কাস্তে—যেমনটি রাজাকোর টুপির

ভেতর পেয়েছিলুম। একই নক্সা। প্রিয়বর্ধন বাঁ হাত বাড়িয়ে কাত্তিটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে ফেরত দিল। বুঝলুম, কাত্তি জিনিসটা কী ও জানেনা।

কাত্তিটাকে গুঁটিয়ে দেখতে দেখতে আবিষ্কার করলুম, নক্সাগুলো একদিকে নেমে গিয়ে যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে বেখাপ্পাভাবে। মাঝখানে একটা তেমনি গাছ আছে, কিন্তু শেকড়গুলো কিনারায় হঠাৎ শেষ হওয়ায় মনে হল, জায়গার অভাবে পুরোটা আঁকা হয়নি, নাকি এটা আঁকিয়ের খেয়াল? ইংরেজি এ বি সি ডি ই একের পর জি'য়ের আধখানা কাটা।

তাহলে কি এটা অন্য একটা কাত্তির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার জন্য? অর্থাৎ রাজাকোর টুপির ভেতর পাওয়া কাত্তিটা না পেলে এটার রহস্য উদ্ধার করা যাবে না?

উল্টোপিঠটা দেখামাত্র আমার সংশয় ঘুচে গেল। উল্টো পিঠে গাছটা নেই শেকড়গুলো আছে। এ বি সি ডিই এক নেই, জি এইচ আই জে কে এল আছে। রাজাকোর কাত্তির উল্টোপিটটা ভাল করে লক্ষ্য করিনি।

এর মানে দাঁড়াল: দুটো কাত্তি পরপর মিলিয়ে রাখলে দুপিঠে দুটো শেকড়ওলা গাছ দেখা যাবে এবং বারোটা রোমান হরফ দেখা যাবে চক্রাকারে সাজানো।

প্রিয়বর্ধনকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে সে আরও হতাশ হয়ে পড়ল।...

ভোর চারটেয় আমাদের মোটরবোটের জ্বালানী ফুরিয়ে গেল। বৈঠা টানা নিরর্থক। তীব্র সমুদ্রস্রোত আর পেছনের ঢেউয়ের ধাক্কায় বোট গতিহারা হতে পারছে না।

দেখতে দেখতে দিনের আলো ফুটে উঠেছিল। সেই ধুসর আলোয় আমাদের এতক্ষণে চোখে পড়ল সামনে দীর্ঘ একটা কালো রেখা যেন। প্রিয়বর্ধন চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে, 'মাটি! মাটি! আমরা মাটির দিকে চলেছি!'

সমুদ্রের চারদিকে চাপচাপ লাল রঙ। প্রথম সূর্যের আভা ঝলমলিয়ে উঠেছে। প্রিয়বর্ধন মোটরবোটের সামনের ড্রয়ার খুঁজে একটা বাইনোকুলার পেয়ে গেল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রটাতে চোখ রেখে সেই কালো রেখাটা দেখার পর সে গম্ভীর মুখে বলল, 'আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মৃত্যু হবে জয়ন্ত! ঈশ্বরের নাম জপ করো! ওই মাটি কবরের মাটি।'

ঝটপট ওর হাত থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে চোখে রাখলুম। দীর্ঘ আলো রেখাটা একটা প্রবাল বলয়। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের ওপর। ডানদিকে অনেকটা জায়গা ভাঙা। আর ভেতর দিয়ে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। দ্বীপের বুকে ঘন জঙ্গল। প্রথম আলোয় সবুজের জেল্লাও চোখে পড়ছিল।

প্রিয়বর্ধন করুণ মুখে বলল, 'আমাদের বোট কোরাল রিকে গিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কী তীব্র স্রোত দেখতে পাচ্ছ না জয়ন্ত?'

বললুম, ওই ভাঙা জায়গাটায় বোট নিয়ে গেলে বেঁচে যাব। এস প্রিয়বর্ধন, বৈঠা নাও!

প্রিয়বর্ধন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৈঠা নিল। দুজনে প্রাণপণে বৈঠা টেনে বোটের মুখ প্রবাল পাঁচিলের ভাঙা অংশটার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলুম। যত এগিয়ে যাচ্ছি, তত প্রবাল পাঁচিলটা উঁচু মনে হচ্ছে। আন্দাজ শ দুই মিটার দূরত্বে পৌঁছে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। ছিটকে গিয়ে সমুদ্রে পড়লুম। জলে না পড়লে গুঁড়ো হয়ে যেত এই মরদেহ।

সাঁতার কেটে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলুম ভাঙা অংশটার দিকে। ভেসে থেকে জয়বর্ধনকে খুঁজছিলুম। দেখি, সেও আমার মতো সাঁতার কাটছে। বুঝলুম ডুবো পাথরে ধাক্কা লেগে বোটটা ভেঙে চুরে গেছে। ওলটপালট খেতে খেতে কাঠের বড় বড় ফালি ফেনার ভেতর মাছের মতো ভেসে চলেছে প্রবাল পাঁচিলের দিকে। ঢেউভাঙার গর্জন, ফেনা, জলোচ্ছ্বাস—চারদিকে যেন প্রলয় চলছে।

তারপর পায়ে শক্ত পাথর ঠেকল। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে প্রিয়বর্ধনকে আর দেখতে পেলুম না। কিন্তু তার কথা ভাবতে গেলে নিজের প্রাণ বাঁচানো সংশয়—তাছাড়া যাকে দেখতে পাচ্ছি না, তাকে উদ্ধার করব কী ভাবে? জলের ধাক্কায় পিছলে যাচ্ছি বারবার। হাঁচড় পাঁচড় করে জল ভাঙা অংশটা পেরিয়ে গেলুম। এবার জলটা শান্ত—নিস্তরঙ্গ। সাঁতার কেটে বিচের দিকে এগিয়ে যেতে আর অসুবিধা হল না। মাথা ঘুরছিল। তখন পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে রইলুম।

আচ্ছন্ন অবস্থায় কতক্ষণ শুয়ে ছিলুম জানি না, এক সময় মনে হল কোথায় যেন অনেক দূরে চাপা গম্ভীর অর্কেস্ট্রা বাজছে। নিশ্চয় এই দ্বীপে কোনো গির্জা আছে। সেখানে এখন প্রার্থনা সঙ্গীতের আয়োজন বুঝি। আশ্রয় পাব। খাদ্য পাব। দেশে ফিরে যাব। আনন্দে মন ভরে গেল।

খুব আশা ও উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালুম। বেলাভূমির ওপর দিকে ঘন বনের ভেতর থেকে সেই চাপা গম্ভীর অর্কেস্ট্রাধ্বনি ভেসে আসছে। কিন্তু যেই কয়েক পা এগিয়ে গেছি, কেউ খ্যানখেনে গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'স্টপ্ ইট্! স্টপ্ ইট্! আই সে—স্টপ্ ইট্!

(ক্রমশঃ)

ক্রোমোজোমের গঠন

সুব্রত কুমার চৌধুরী

আমরা জীবনবিজ্ঞান পাঠ করতে গিয়ে একটা শব্দের সঙ্গে বার বার পরিচিত হয়েছি, যার নাম ক্রোমোজোম। প্রত্যেকের মনে ইতিমধ্যে ক্রোমোজোম সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু জানার কৌতূহল জেগে উঠেছে। এই আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, যেগুলি—ক্রোমোজোম কি, এটা কেমন দেখতে, এটা কত প্রকারের, এর রাসায়নিক উপাদান গুলোই বা কি কি।

কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিওজালিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি সরু সূতার ন্যায় অংশে পরিণত হয়, এইগুলিকে ক্রোমোজোম (Chromosome) বলে।

ক্রোমোজোমের আকার সাধারণতঃ লম্বা হয়। কিছু কিছু ক্রোমোজোম আকৃতিতে স্থূল। তবে ক্রোমোজোমের আকার সবসময় একই রকম থাকে না। কোষবিভাজনের অন্তবর্তী—কালীন (বা Interphase) দশায় এগুলোকে প্যাঁচানো সরু সূতার ন্যায় দেখায়। আবার মেটাফেজ বা অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমোজোমগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং দণ্ডাকার হয়, আর তখনই ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থান সুস্পষ্ট হয়। দৈর্ঘ্যে ক্রোমোজোম সাধারণতঃ 0·2 হইতে 50 mm এবং প্রস্থে 0·2 হইতে 2 mm হয়ে থাকে।

এবার ক্রোমোজোমের গঠন সম্বন্ধে বলা যাক্—প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের বাইরের দিকে একটা আবরণ থাকে; যাকে পেলিকল্ বলে। এই আবরণীর ভিতরে জেলীর ন্যায় থকথকে একপ্রকার পদার্থ থাকে, নাম ম্যাট্রিক্স। ম্যাট্রিক্সে সর্পিলাকারে সজ্জিত থাকে দুইখণ্ড ক্রোমোনিমা। ক্রোমোনিমার গাত্রে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানাদার অংশ থাকে—এইগুলিকে ক্রোমোমিয়ার বলে।

এছাড়া ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ার নামে একটা বর্ণহীন অংশ থাকে। এই সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোজোমকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) মেটাসেণ্ট্রিক ঃ

সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের মধ্যভাগে থাকে।

(ii) সাবমেটাসেণ্ট্রিক ঃ মধ্যস্থান থেকে সরে বাম বা ডানদিকে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে।

(iii) অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের একপ্রান্তে অবস্থান করে।

(iv) টেলোসন্ট্রিক সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের অগ্রভাগে থাকে।

এতদ্ব্যতীত, কোনও ক্রোমোজোমে দুই বা ততোধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে তাকে যথাক্রমে ডাই ও পলিসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে।

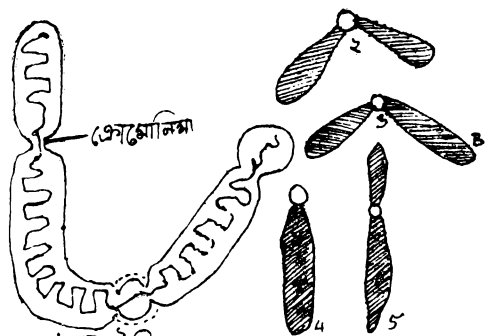

1. ক্রোমোজোমের অসম্পূর্ণ আকৃতি
2. মেটাসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম
3. সাবমেটাসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম
4. টেলোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম
5. অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম

এখন জানা দরকার, ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদান-গুলো কি কি; বস্তুতপক্ষে নিউক্লিক এ্যাসিড ও প্রোটিনই ক্রোমোজোমের প্রধান রাসায়নিক উপাদান। একটা ক্রোমো-জোমের দেহের ওজনের 90 শতাংশ নিউক্লিও প্রোটিন এবং অবশিষ্ট 10 শতাংশ রেসিডিউয়াল ক্রোমোজোম (Residual Chromosome)। ক্রোমোজোমের প্রধান নিউক্লিক অ্যাসিড হল (DNA)। নিউক্লিও প্রোটিনে 45% DNA এবং বাকী 5 5% হিস্টোন নামক প্রোটিন। রেসিডিউয়াল ক্রোমোজোমে 13 শতাংশ (RNA), 2 শতাংশ DNA এবং বাকী 85 শতাংশ প্রোটিন।

বেলতা, পাল্লা, 24 পরগণা।

কিডনী ট্রান্সপ্লান্টেশন ও ডায়ালিশিশ

শচীনন্দন আঢ্য

1962 খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হল এক অদ্ভুত ক্লিনিক যার নাম হল "আউট অব হসপিটাল ডায়ালিশিশ সেন্টার"। কেন হল, কি জন্য হল তার খোঁজ হয়ত আমরা অনেকেই রাখি না, কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা রাখেন। কেননা তাঁদেরই চিন্তা করতে হয় ডায়ালিশিশ নিয়ে।

ডায়ালিশিশ হচ্ছে রক্ত শোধক যন্ত্র। কিডনী ধ্বস্ত রুগীকে রক্ত শোধন করে বাঁচাতে হলে এই যন্ত্র অপরিহার্য্য। কিন্তু এই যন্ত্রের চাহিদা এত বেশী আর উৎপাদন এত সীমাবদ্ধ যে তা বিশ্বের প্রতি হাসপাতালে আনতে হলে বহু বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। ডায়ালিশিশ যন্ত্রের বর্তমান মূল্য ৯০ হাজার টাকা। কলকাতায় মাত্র শেঠ সুখলাল করনানি হাসপাতালেই এই যন্ত্রটি আনা হয়েছে। এই যন্ত্রের জন্মভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই 1969 সাল পর্য্যন্ত মেসিন ছিল মাত্র দুহাজার।

এই চিকিৎসা যন্ত্রের আবিষ্কার কেন হল, সেটা কিন্তু আমাদের আগে জানা দরকার। জেনে রাখা দরকার যে মানুষের দেহে প্রতি সেকেণ্ডে বিপাকিয় ক্রিয়ার ফলে উৎপাদিত হচ্ছে ইউরিয়া ইউরিক এ্যাসিড. ক্রিয়াটিনিন জাতীয় বিভিন্ন নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জনীয় পদার্থ। যে সবকে শোধন করছে মানব দেহেই অবস্থিত দুটি কিডনী। তা না হলে শরীরে নানান বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

যদি কোনরকমে একটি কিডনি খারাপ হয়, তাহলে আর একটি কিডনী সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে শোধন কাজ চালিয়ে যায়। জিন্তু কোন রকমে যদি দুটি কিডনীই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তখন রুগীর মৃত্যু অবধারিত। যেজন্য চিকিৎসকরা একটি কিডনী বাতিল করে অন্য দেহ থেকে আর একটি কিডনী নিয়ে রুগীর দেহে সংযোজন করে রুগীকে বাঁচিয়ে তোলেন। এ চিকিৎসা পদ্ধতীকে বলা হয় "ট্রান্সপ্লানটেশন" পদ্ধতি।

ট্রানসপ্লানটেশনের দ্বারা সর্বক্ষেত্রেই যে চিকিৎসা সফলতা লাভ করেছে তা নয়। কেননা অন্যদেহ থেকে লাগানো কিডনীর জীবানু শক্তি সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টাই বর্তমান থাকে। তাছাড়া একদেহের এণ্টিজেনে না মিলতেও পারে। যে জন্য একই পরিবারের অন্য দেহ থেকে নেয়া কিডনীই বেশী কাজে লাগে। কিন্তু এসব ব্যাপারে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। রুগীর দেহের সমগোত্রীয় কিডনী—সংগ্রহ করতে রুগী এবং চিকিৎসক উভয়কেই বহুদিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়। যেজন্য বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির অনুসন্ধানে লেগে পড়েন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়াম ফলফ্ নামে এক চিকিৎসা বিজ্ঞানী—এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যার মাধ্যমে কিডনীর সব কাজটাই কৃত্রিম উপায়ে করা যায়।

যন্ত্রের নাম ডায়ালিশিশ মেশিন। রুগীর দেহের রক্ত বাইরে এনে শোধন করে তা আবার দেহে ঢুকিয়ে দিয়ে রুগীকে সুস্থ করাই এই মেশিনের কাজ। একজন রুগীকে একটানা ৬ থেকে ১০ ঘণ্টা রক্ত শোধন করা হয় সপ্তাহে তিন দিন।

রুগীর হাতের শিরা থেকে রক্ত টেনে টিউবের সাহায্যে ঐ যন্ত্রে পাঠানো হয়। এবং পরিশোধনের পর পুনরায় তা হাতের রক্তপ্রবাহী শিরা দিয়ে দেহে প্রবেশ করানো হয়।

মেশিনটির গঠন ঠিক ঘরে রাখা রিফ্রেজাটারের মত। রক্তপ্রবাহ অক্ষুন্ন রাখতে এতে আছে পাম্প ব্যবস্থা, রক্তের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও যাতে রক্ত জমাট বেঁধে না যায়, তার খুঁটিনাটি ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি।

মেসিনের মধ্যে আছে দুটি প্রকোষ্ঠ। সেলুলজ দ্বারা নির্মিত একটি অর্দ্ধভেদ্য পর্দার সাহায্যে প্রকোষ্ঠ দুটি বিভক্ত। রুগী দেহের রক্ত নলের সাহায্যে তা চালনা করা হয় একটি প্রকোষ্ঠে। আর তার পাশের প্রকোষ্ঠে চালনা করা হয় বিশেষ ভাবে তৈরী এক রাসায়নিক তরল। তারপর শোধিত ঐ রক্ত টিউবের সাহায্যে রুগীর দেহে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। রুগী তাতে সুস্থ হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতিকেই বলে ডায়ালিশিশ্।

যুক্তরাষ্ট্র 1960 খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটন হাসপাতালে তিনজন রুগীকে সর্বপ্রথম দীর্ঘকাল ডায়ালিশিশ করে বাঁচিয়ে তোলে। কেউ কেউ 11/12 বছর পর্য্যন্ত বেঁচেছিল। আবার কাউকে কাউকে ৮ বৎসর ডায়ালিশিশ করার পর কিডনী ট্রানসপ্লানটেশনও করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে প্রয়োজনীয় বিবর্তনের সাথে সাথেই চিকিৎসার পদ্ধতিরও পরিবর্তন হচ্ছে বা হবে। কিডনী ট্রানসপ্লানটেশনও সেইভাবে এসেছে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কিডনী পরিবর্তন করেন সোভিয়েট বিজ্ঞানী ডাঃ ভারনব। সদ্য মৃত এক ব্যক্তির দেহ থেকে তিনি কিডনীটি নিয়ে 26 বৎসর বয়স্কা এক রুগীনীর দেহে সংযোজিত করেন। কিন্তু তা মাত্র দুদিন সক্রিয় ছিল। তারপর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন শহরে এক মার্কিন চিকিৎসক জমজ দু ভায়ের মধ্যে এক ভায়ের কিডনী নিয়ে আর এক ভায়ের দেহে সংযোজিত করেন। তাতেই কিডনী পরিবর্তনী শল্য চিকিৎসা নূতন সাড়া জাগালো। তারপর থেকে আমেরিকাতেই দশ হাজারেরও বেশী কিডনী পরিবর্তন হয়েছে।

ভারতেও ডায়ালিশিশ মেসিন আসছে আস্তে আস্তে বড় বড় হাসপাতাল সমূহে। আর কিডনী ট্রানসপ্লানটেশান সাফল্যের সঙ্গে চলেছে কলকাতা দিল্লী ভেলোর চণ্ডীগড় এর মত বড় বড় শহরের হাসপাতাল গুলিতে।

92 শরৎ চ্যাটার্জী রোড, হাওড়া-4

মনু মাছ

শ্রীরেন দত্ত

সুন্দরবনের নোনামাটির উদ্ভিদের ন্যায় নোনা জলের মাছেরাও বিশেষ অভিযোজন (adoption) দ্বারা বেঁচে আছে। এখানকার নোনা জলের ভেটকী, ভাঙন, পারসে, বহু রকমের চিংড়ি মাছের সাথে আমরা পরিচিত। কিন্তু এই সব মাছের থেকে আলাদা চরিত্রের একটা মাছের কথাই বলব।

ভূতির-গাঙ ধারেই তখন কুপ খোলা হয়েছে। বড় বড় নৌকোগুলোতে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বোঝাই করা হচ্ছিল। সেদিন বেলা প্রায় গড়িয়ে এসেছে, দলের সবাই জঙ্গলের কাজ সেরে নৌকোর দিকে চলে গেছে। গোছ গাছ করতে করতে আমার একটু দেরি হয়ে গেল। তাই ওদের বেশ পিছনে পড়ে গেছি। ফেরার পথে দেখলাম গাং ধারে গাছে গাছে বানরের (Rhesus Macaque) দল হুটো পাটি করছে। দূর থেকে দেখলাম নদীর চরের একটা নির্জন জায়গায় একটা বানর চুপটি করে বসে আছে। ওর হাবভাব দেখে খুব আশ্চর্য লাগল। আমি চুপি চুপি ওর দিকে নজর রাখছি, হঠাৎ বানরটা লাফ দিয়ে কি যেন ধরেই মুখে পুরল। বেশ খানিকক্ষণ পরে আবার কি যেন ধরেই মুখে পুরে নিল। ভাল করে দেখে বুঝলাম, বানরটা মনু-মাছ ধরে ধরে খাচ্ছে।

তোমরা সকলেই জানো জলেই মাছের বাস, মাছকে জলছাড়া করলেই তো তার মৃত্যু। কিন্তু সুন্দরবনে এক-রকম মাছ আছে তারা সমুদ্রতীরে বা নদীর মোহনার চরায় লেজ উঁচু করে ঘণ্টার পর ঘন্টা ধরে ঘুরে বেড়ায়। সুন্দরবনের বসতি এলাকার লোকেরা এই মাছকে বলে মুন-মাছ, বাংলাদেশের খুলনা এলাকার লোকেরা এদের বলে মেনী-মাছ। এদের বৈজ্ঞানিক নাম Boleopthlmus।

এদের পাঁচটা প্রজাতি ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ, অষ্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার সমুদ্র তীরে ঘুরে বেড়ায়। লম্বায় দু-আড়াই ইঞ্চির মত হবে, স্থানভেদে গায়ের রং আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। সুন্দরবনে ওদের পিঠ সাদাটে ধুসর, তলপেট সাদা। পরীক্ষা করে দেখেছি একটা মুন-মাছ একটানা ন' ঘণ্টা জলছাড়া হয়ে ডাঙায় ঘুরছে আর কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। এরা আবার গাছে চড়তেও ওস্তাদ। জোয়ারের নোনাজল যখন গাছের গুঁড়ির দু-তিন ফুট পর্যন্ত ওপরে ওঠে, ওরাও তখন গুড়ি বেয়ে বেয়ে জলের আগে আগে ওপরে উঠতে থাকে। স্থলেই হোক আর গাছেই হোক, কেউ তাড়া করলে চিড়িং চিড়িং করে লাফ দিয়ে জলে পড়বে আর টুপ করে ডুব দেবে। কিছুক্ষণ পরে আবার সুড় সুড় করে জল থেকে ডাঙ্গায় উঠে আসছে। ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গেছে ওদের পাকস্থলীতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটানু আর ছত্রাকে ভর্তি। ওদের চোখ দুটো নাকের মাথায় দুপাশে ছোট্ট ছোট্ট পুঁতির মত লাগানো আর সাধারণ মাছের মত ওদের গায়ে আশও নেই, পাতলা চামড়া দিয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা, লেজটা ঊর্ধমুখী। ভিজে ডাঙ্গায় সারাক্ষণ ওরা খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, রৌদ্রের তাপে যখন গায়ের চামড়া শুকিয়ে আসে, আস্তে আস্তে নেমে পড়ে জলে, আর একটু গা ভিজিয়ে নিয়েই গুটি গুটি ডাঙ্গায় উঠে আসে। মনু-মাছ অন্যান্য সাধারণ মাছেদের মত কানকোর ঝিল্লির সাহায্যে অক্সিজেন নেয় না, ওরা ডাঙ্গার প্রাণীদের মতই ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায়।

ভেটকী, পাঙাশ প্রভৃতি নোনাজলের মাছেরাই ওদের প্রধান শত্রু। কাঁকড়া তার শক্ত দাঁড়ায় চেপে ধরে একটা মনু মাছ খাচ্ছে, এমনও দেখেছি। ডাঙ্গায় বানর আর বুনো শূকর ওদের বাগে পেলে ছাড়ে না। মানুষ এই মাছটাকে খায় না ; তাই ওরা আজও সমুদ্রতীরে আর গাং চড়ে হাজারে হাজারে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সন্দেশ খালী, 24 পরগণা

সংখ্যা নিয়ে লুকোচুরি খেলা

দীপক চক্রবর্তী

একটি ছেলেকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়—কোন বিষয়টি তোমার কাছে শক্ত লাগে?

—চট্‌পট্‌ উত্তর দেবে,—অংক।

যা বিদঘুটে জিনিষ। কিছুতেই মাথায় ঢোকে না।

শুধু ঐ ছেলেটি কেন, আরও অনেকেই এমন বলবে। আবার এই অংক নিয়ে কত না মজার খেলা করা যায়। এস, আজ আমরা দুটো সংখ্যা নিয়ে মজার খেলা করি। সংখ্যা দুটো হ'ল এক আর সাত।

তোমাকে যদি বলি এক-কে-সাত দিয়ে ভাগ করত।

—তুমি বলবে এ আর কি? খুব সহজেই পারবো।

$1 \div 7 = 0.142857142857\cdots$ কিছুতেই ভাগ আর শেষ হচ্ছেনা। তাই না! তোমার খাতার সাইজ যদি কলকাতা থেকে দিল্লী হয়, তাতেও ভাগফলটা খাতায় ধরবে না। মহা ফাঁপড়ে পড়েছ! একটু ভাবলেই কিন্তু সহজে বিপদ থেকে পরিত্রান পাওয়া যাবে। কেমন ক'রে? —দশমিকের পর সাত নম্বর সংখ্যাটার মাথায় ছোট্ট একটি টোপর পরিয়ে দাও। তাহলেই হবে। যাকে বলে পৌনঃপৌনিক। তার মানে হলো এক থেকেই আবার একই ভাগফল ফিরে আসবে। এই ফিরে আসা বারবারই চলতে থাকবে। যতদূর খুশি ভাবতে পার।

—এতো হলো; কিন্তু মজার খেলাটা?

—হ্যাঁ, এই ভাগফলটাতেই লুকিয়ে আছে আমাদের খেলা।

আগেই দেখেছ $\frac{1}{7} = 0.142857\cdots$ অর্থাৎ শূন্যস্থান-গুলোতেই প্রথম থেকে সংখ্যাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটছে। দুই থেকে ছয় পর্যন্ত পরপর সংখ্যাগুলোকে সাত দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল গুলো পাওয়া যায় তা উপ'রের ভাগফলটাতেই লুকিয়ে রয়েছে।

তোমরা অবাক হচ্ছ তাই না!

তাহলে লক্ষ কর ঃ

ভাগফলটাতে এক-এর ঠিক উপরের সংখ্যা কোনটি?

—নিঃসন্দেহে দুই।

$\frac{2}{7}$ এর ভাগফল দুই থেকে শুরু হয়ে বৃত্তাকারক্রমে ঘুরে দুইয়ের আগের সংখ্যা চারে শেষ হবে।

অর্থাৎ $\frac{2}{7}$ এর ভাগফল হবে — 0.285714

আর $\frac{3}{7}$ এর ভাগফলের ক্ষেত্রে, তিন এর ঠিক উপরের বড় সংখ্যা যেহেতু চার, তাই তিনের সাতের ভাগফল হবে $\frac{3}{7} = 0.428571$

এখানেও ভাগফলটা চার থেকে শুরু করে চার-এর ঠিক আগের সংখ্যা এক-এ এসে শেষ হচ্ছে।

একই রকম ভাবে চার এর ঠিক উপরে পাঁচ আছে বলেই $\frac{4}{7} = 0.571428\cdots$

এবং পাঁচ-এর ঠিক উপরে সাত, ও ছয় এর ঠিক উপরে আট থাকায়

$\frac{5}{7} = 0.714285\ldots$

$\frac{6}{7} = 0.857142\cdots$

তাহলে লক্ষ্য করলে ত একের সাত সংখ্যাটা কেমন মজার। $\frac{1}{7}$ এর ভাগফলটা করলেই $\frac{2}{7}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{4}{7}$, $\frac{5}{7}$, $\frac{6}{7}$-এর ভাগফল কত হবে না কষেই ঝট্‌পট্‌ লিখে ফেলা যায়।

কি মজার খেলা দেখলে তো? একটা ভাগফলের মধ্যে অন্যান্য ভাগফলগুলো কেমন লুকিয়ে রয়েছে। এ যেন লুকোচুরি খেলা। ঠিক ঠিক মত তাকালেই সহজে ধরে ফেলা যায়।

38এ/2 এম. সি, গাডে'ন রোড, কলকাতা-30

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিয়মাবলী

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যা পিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকা ভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

মোহনচূড়া

অজয় হোম

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

এই যে পাখি যাকে দেখলাম কাকালীতলায়, রাজা সলোমনের বরে যার মাথায় সোনার মুকুট উঠে পক্ষিকূলের রাজা সেজেছিল, সে হল পুত্রপ্রিয় বংশের (উপুপিকি) ওই নামে একটি মাত্র গণের (উপুপা) প্রজাতি ; নাম—হুপো, মোহনচূড়া (উপুপা এপপস্)। সাহিত্যিক বনফুলের দেওয়া 'মোহনচূড়া' নামটি সার্থক বলে মনে হয়। হিন্দী—হুদ্‌হুদ্। ইংরেজি—হুপো।

মোহনচূড়া বা হুপো লম্বায় 12 ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথার উপর হাতপাখার মতন ফিকে বাদামী চূড়া ; সামনে থেকে পিছনে পালকগুলি এসে লম্বা হয়েছে ; চূড়ার প্রতিটি পালকের ডগায় কালো-সাদা দাগ। ঘাড় ও গলার দু'পাশ এবং কাঁধের উপর থেকে ডানার বাঁক পর্যন্ত নিষ্প্রভ ফিকে ছাই-বাদামী। বাকি পিঠের পালকে চওড়া কালো-সাদা পটি। ওই পটি ডানার উপরেও। ডানা গোলাকার। লেজের ডগায় বেশ চওড়া কালো পটি, তারপর সাদা, আবার কালো। চিবুক সাদাটে, গলা এবং বুক খুবই ফিকে বাদামী ; বুকের দু'পাশে ছাইভাব। বাকি তলার পালক সাদা, তার উপর কালো এবং ধূসর-ছাইয়ের বড়ো বড়ো টান। কনীনিকা লালচে-বাদামী। সরু বাঁকানো ছোটো জিভ সহ চঞ্চু শিঙে-কালো, গোড়াটা ফিকে গোলাপী। পা সীসে রঙা।

বাসস্থান—ইওরোপ, এশিয়া, দক্ষিণে আফ্রিকা, মাদাগাসকার ; মধ্যপ্রাচ্য, চীন, ইন্দোচীন, মালয় ও সুমাত্রা। ভারতে 4টি উপজাতি। প্রথম (উ এ এগপস্)—পাকিস্তানে বেলুচিস্তান ; কাশ্মীর থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে। পাকিস্তান থেকে শীতে পরিযায়ী হয় রাজস্থান, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, উত্তর বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারে 7 হাজার ফুটের ভিতর। দ্বিতীয় (উ এ স্যাটুরাটা)—তিব্বত এবং হিমালয়ের 9 হাজার ফুটের উপর নেপাল ও সিকিমে। শীতে পরিযায়ী হয় নেপালের সমতল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, আসাম এবং বাংলাদেশে। তৃতীয় (উ এ সিলোনেনসিস)—নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম, দক্ষিণে নামে মধ্যভারত

থেকে বোম্বাই, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ থেকে সিংহলে 5 থেকে 7 হাজার ফুটের মধ্যে। চতুর্থ (উ এ লংগিরসট্রিস)—আসাম ও বাংলাদেশে 5 হাজার ফুটের ভিতর।

খাদ্য—যাবতীয় ভূমিজ পোকামাকড়। ক্বচিৎ শূন্যে অথবা গাছের কাণ্ড বা শাখা থেকে সংগ্রহ করে। ভালোবাসে শুঁয়োপোকা, ঝিঁঝিঁ, ঘুরঘুরে, ঘাসফড়িং, কেঁচো এবং শস্যের অনিষ্টকারী সবরকম পোকা।

স্বভাব—মোহনচূড়া বা হুপো ঘন জঙ্গল পছন্দ করে না। একটু খোলামেলা জায়গা, বিশেষত গাঁয়ের ধারে-কাছে বড়ো বড়ো গাছের বাগান, ঝোপঝাড় সেটাই পছন্দ। মেটে বাড়ির দেয়াল বা পরিত্যক্ত পুরোনো পাকা বাড়িতেই আস্তানা গাড়ে। মানুষের আবাসের কাছে খাদ্য সংগ্রহ ব বাসা বানাতেও দেখা যায়। একা বা জোড়ায় চরতে বেশি দেখি।

খাদ্য সংগ্রহ করে মাটি থেকেই বেশি। রাস্তার আশ-পাশে, ঘাসের মাঠে বা ওই ধরনের স্থান যেখানে ঘুরঘুরে, কেঁচো বা ভূমিজ পোকার শূককীট পাবার সম্ভাবনা সেখানেই মোহনচূড়াকে দেখতে পাওয়া যায়। কৃষির খুব উপকারী পাখি। লম্বা চঞ্চু দিয়ে কৃষির অনিষ্টকারী পোকাদের

মাটির ভিতর থেকে টেনে বার করে। হাঁটা ও দৌড়ানো এদের খুব সাবলীল। মাটিতে এইভাবে চলাফেরার মাঝে ঘাসের গোড়া, ঝরাপাতা বা জঞ্জাল উলটে বা সরিয়ে দেখে কোনো পোকা সেখানে আশ্রয় নিয়েছে কিনা। সামান্যতম বিপদের আশঙ্কা বা কারোর আগমণ সম্ভাবনা বুঝতে পারলেই উড়ে গিয়ে গাছে বা বাড়ির দেয়াল অথবা পাঁচিলে আশ্রয় নেয়।

খাদ্য সংগ্রহের সময় মোহনচূড়া তাঁর ঝুঁটি নামিয়ে বন্ধ করে রাখে। উড়ে গিয়ে কোথাও বসলে বা কোনও কারণে উত্তেজিত হলে সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁটি খাড়া করে পাখা মেলে দেয়। সাধারণত ওড়ার মধ্যে কেমন যেন ধীর ভাব এবং কোনদিকে যাবে তা যেন ঠিক করতে পারছে না বলে ওঠাপড়া ঢেউয়ের ভাবটা একটু প্রকট। এইভাবে উড়তে উড়তে হঠাৎ বাঁ বা ডানদিকে এমন বোঁ করে ঘুরে যায় যে তখন মনে হয় কে যেন পিছন থেকে হুকুম দিয়েছে 'লেফট' বা 'রাইট হুইল কুইক টার্ন' করার।

ডাকটা কর্কশ নয়, খুব সুরেলাও নয়, একটু জোর— 'উপ্ উপ্···হু-পো-পো···হুট হুট···হুদ'। আরও একটি কর্কশ শব্দ গলা দিয়ে বার হয় যখন বাসার মধ্যে থাকে। এছাড়া অন্য কোনও আওয়াজ বা সংগীত নেই। এই কণ্ঠ ধ্বনি থেকেই হুপো বা হুদ্ হুদ্ নামের উৎপত্তি।

পোষ মানলে মোহনচূড়া বা হুপো বেশ পোষ মানে। ভূমিজকীট প্রধান খাদ্য বলে ছাতু ও পিঁপড়ের ডিম একটু অধিক পরিমাণে খাওয়াতে হয়। ধূলি স্নানে ওদের আনন্দ। ওলটপালট খেয়ে ধুলো মেখে, তারপর গা ঝাড়া দিয়ে ধুলো ওড়াবার পর যখন লম্বা বাঁকানো চঞ্চু দিয়ে গাত্রমার্জনা করে তখন তা দেখবার মতন। বন্দী অবস্থাতেও বাসা বানাবার উপকরণ পেলে বানায় এবং ডিম ফুটিয়ে ছাশ তোলে।

সভ্যতার সঙ্গে মোহন চূড়ার একটা সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। আমি সভ্য যুগে মিশর ও ক্রিটদ্বীপের দেয়ালের গায়ে দেখি এদের ছবি। সেযুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের সাহিত্য এবং চিকিৎসাশাস্ত্রেও এর পরিচয় পাই। ক্রিটদ্বীপের রাজা জেরেউস এই পাখির দেহ ধারণ করেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে মহম্মদীয়দের উপাখ্যানে পাই রাজা সলোমনের প্রিয় বন্ধু, সহচর এবং বিশেষ দূত হিসেবে; আর সেই সঙ্গে মুকুট লাভের উপকথা। বাইবেলে হুটুমা পাখির (ল্যাপউইং) যা বর্ণনা তা এই মোহনচূড়ার। সবচেয়ে বড়ো গুণের খবর পাওয়া যায় তার দেহের বিভিন্ন অংশের মাংসের উপকারিতার। মিশরীয় যুগ থেকে শুরু করে 1752 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ডাঃ আর জেমস-এর চিকিৎসাশাস্ত্র 'ফার্মাকোপিয়া ইউনিভার্সালিস'-এ উল্লেখ পাওয়া যায় যে এর মাংসে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যেমন বাড়ে তেমনই বাড়ে স্মৃতি শক্তি। ভারতেও অনেকের এসব গুণের পরিচয় থাকায় কোথাও কোথাও মোহন চূড়ার মাংস খাওয়ার রীতি চালু আছে।

মোহন চূড়া প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে মে। কোথাও কোথাও জুন-জুলাই পর্যন্ত দেখা যায়। বাসা বানায় কোনো গর্তে'র মধ্যে। এ গর্ত নিজে খুঁড়ে তৈরি করে না। আপনা থেকেই যদি গর্ত থাকে গাছে, দেয়ালে বাড়ির ছাদে, এমনকি পরিত্যক্ত মাটির ঘরের মেজেতেও হলে চলে কিন্তু সর্বত্র অন্ধকার চাই। অন্ধকার হল বাসার প্রধান উপাদান। সেই অন্ধকার গর্তে যেমন তেমন করে বিছানো থাকে কিছু ঘাস, লোম, পাতা বা পালক।

ডিমে তা দেবার সময় স্ত্রী-পাখির গা থেকে এক রকম দুর্গন্ধ বার হতে থাকে। এই গন্ধ প্রীন গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণের ফলে ঘটে থাকে। বাসা থেকে সে এই সময় বার হয় না বললেই চলে। পুরুষ-পাখিই খাদ্য সংগ্রহ করে এনে তাকে খাওয়ায়। ডিম থেকে ছানা ফুটে বার হবার আগে ও পরে বাসার ভিতরের কোনও ময়লা কখনও পরিষ্কার করে না। সে কারণেও দুর্গন্ধ কিছু কম ছড়ায় না। দুর্গন্ধ ও নোংরামির জন্যে ইহুদী-আইনে শূয়োরের মতন এর মাংসও 'অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হয়। ওদিকে টেস্টামেণ্টে হুপো সুখাদ্য হিসেবে গণ্য। ইওরোপে খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই মাংসের চলন খুব বেশি।

মোহন চূড়া ডিম পাড়ে 3 থেকে 5টি। সেজন্য বাসার ভিতর প্রথম থেকে ষষ্ঠ সংখ্যক ছানার আকার পরস্পরের মধ্যে অনেক তফাৎ হয়। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই সন্তানদের খাদ্য সংগ্রহ করে খাওয়ায়। সন্তানদের প্রতি একটা মমতা এই সময় লক্ষিত হয় যা মানবিক পর্যায়ে পড়ে। মোহন চূড়ার ডিম একটু লম্বাটে ধরনের। খোলা মসৃণ ও শক্ত। ডিমের উপর ছিট বা ছোপ কিন্তু চকচকে ভাবটা একদম নেই। প্রথম অবস্থায় ডিমের রঙ সাদাটে সবুজাভ-নীল থেকে সাদাটে জলপাই-পাটকিলে, পরে তা দিতে দিতে ওই রঙ বদলে হয় ময়লাটে পাটকিলে। ডিমের মাপ—লম্বায় 100, চওড়ায় 0' 55 ইঞ্চি।

8/1 ডঃ বীরেশ গুহ স্ট্রীট, কলি-17

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা

সবিতা ধর

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর পর যে বিশ্ববিশ্রুত বাঙালী বিজ্ঞানীর নাম আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে, তিনি হলেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা।

6 অক্টোবর, 1893। এখন থেকে 90 বৎসর পূর্বে এই পবিত্র দিনটিতে পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) ঢাকা জেলার সেওড়াতলী গ্রামে এক দরিদ্র 'সাহা পরিবারে' তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা জগন্নাথ সাহা ও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী।

মেঘনাদ সাহা নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন।

1909 সালে কিশোরীলাল জুবিলী স্কুল থেকে সমগ্র পূর্ববঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করে এনট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

1911 সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আই. এস. সি. পাশ করেন।

1913 সালে ঐ কলেজ থেকে অংক শাস্ত্রে সম্মান (অর্নাস) সহ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেনীর ২য় স্থান লাভ করে বি. এস. সি পাশ করেন।

1915 সালে মিশ্র অংক শাস্ত্রে এম. এস. সি পাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর ২য় স্থান লাভ করেন। প্রথম হন সত্যেন্দ্রনাথ বসু (পরবর্তী কালের একজন খ্যাতনামা পদার্থ বিজ্ঞানী)।

1916 সালে মাত্র 23 বৎসর বয়সে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের লেক্চারার হিসাবে যোগদান করেন। পরের বৎসর তিনি বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের লেক্চারার রূপে যোন দান করেন।

ছাত্রাবস্থায় তিনি জার্মান ভাষা শেখেন। তাই বিশ্ব-বিশ্রুত পদার্থ বিজ্ঞানী দার্শনিক অধ্যাপক আলবার্ট আইন স্টাইনের 'আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব' অধ্যয়ন করতে সমর্থ হন। এবং অধ্যাপক সতেন্দ্রনাথ বসুর সংগে যুগ্ম ভাবে তা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন।

1917 সালে লনডনের বিখ্যাত ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিন-এ তাঁর প্রথম গবেষনা পত্র 'মেকস্ ওয়েলস্ স্টেট্সেস্' প্রকাশিত হয়। উক্ত ম্যাগাজিনে, তিনি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সংঙ্গে যুগ্ম ভাবে 'সাহা-বোস ইকুয়েসন অব্ স্টেট' নামে এক গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন।

1918 সালের 16ই জুন মেঘনাদ সাহা রাধারাণী রায় কে বিবাহ করেন।

1918 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে তাঁর মৌলিক গবেষণার জন্য ডি. এস. সি ডিগ্রী প্রদান করে। পরের বৎসর 'পি আর এস' হন।

মেঘনাদ সাহা

1919 সালে তিনি 'থিয়োরি অব থারমাল আয়োনাই-জেশন' আবিস্কার করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন।

এর পর দুই বর্ষাধিক সময় গবেষনার কাজে বিদেশে কাটান।

1921 সালে তিনি, পদার্থ বিজ্ঞানের 'খয়রা অধ্যাপক' হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। 1923 সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের পূর্ণ অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। 1938 সাল পর্যন্ত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

1925 সালে, তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি পদ অলংকৃত করেন এবং 1934 সালে ইহার মূল সভাপতি হন।

1927 সালে তিনি এফ্ আর্ এস্ সম্মান লাভ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থা তাঁকে সম্মানীত করেন।

1931 সালে অধ্যাপক সাহা এলাহাবাদে 'অ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্স' স্থাপন করেন।

1935 সালে, 'সায়েন্স এ্যাণ্ড কালচার' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

1936 সালে 'কার্নেগী পুরস্কার' লাভ করেন।

1938 সালে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের 'পালিত অধ্যাপক' ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন।

1943 সালে তিনি 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভ্যাশন অব্ সায়েন্স' এর ডিরেক্টর পদ অলংকৃত করেন।

1945 সালে তিনি 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি'র (বর্ত্তমান এসিয়াটিক সোসাইটি), কলিকাতা সভাপতি নিযুক্ত হন।

1948 সালে, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এর সভাপতিত্বে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ' এর তিনি সদস্য ছিলেন।

1948 সালে তিনি 'ইনস্টিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিকস্' স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর, 1958 সালের আগস্ট মাসে ইহার নামকরণ করা হয়—'সাহা ইনস্টিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিকস' (SINP)। তিনি ইহার প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর ছিলেন।

1950 সালে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা দরিদ্রদের প্রাথমিক সাহায্য-এর জন্য 'ইস্ট বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' গঠন করেন।

1952 সালে, লোকসভার সদস্য হন।

1956 সালের 16ই ফেব্রুয়ারী সকাল 10-15 মিনিটে, এই জগৎবিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী, রক্ত-চাপে আক্রান্ত হয়ে ইহলীলা সম্বরন করেন।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা কেবল খ্যাতনামা বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক, দেশপ্রেমিক ও রাজনীতিবিদ্। 'রবীন্দ্রকাব্য'—এতেও তাঁর পারদর্শীতা ছিল।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা সর্বমোট ৪৪টি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। তার মধ্যে 35টি ভারতে ও 53টি বিদেশে প্রকাশিত হয়।

পরিশেষে, উল্লেখনীয় যে আমেরিকার খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী, নোবেল লরিয়েট আর্থার হোলী কম্পটন (Arthur Holly Compton), অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার নাম পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার এর জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু আমাদের দুভার্গ্য যে 'নোবেল লরিয়েটস্' এর তালিকায় অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার নাম দেখি না!

নিউ কলোনী, বঙাইগাঁও, 783 380

প্রাণী-বিচিত্রা

শৈল চক্রবর্তী

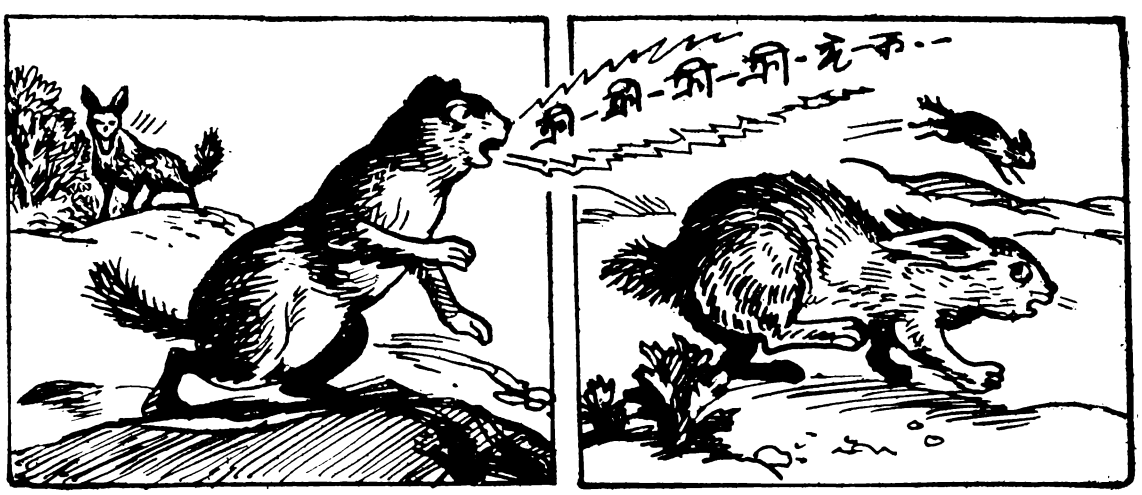

অনেকটা খরগোশের মতই দেখতে মারমট। সে বনের জীবদের খুব বিপদের সময় বাঁচিয়ে দেয়। তার গলার আওয়াজ সাঁইরেনের মত, দূরে যদি বাঘ বা নেকড়ে নজরে পড়ে তখনই সে এমন সাইরেণ বাজিয়ে দেবে যে অন্য জন্তুরা দৌড়, দৌড়, দৌড়---

মরা হাড়েও কথা বলে

• পার্থসারথি চক্রবর্তী •

অনেক দিন আগেকার কথা। একজন বিত্তশালী মহিলা নিখোঁজ হয়েছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও দীর্ঘদিন তাঁর কোনও হদিস পাওয়া গেল না। বুঝতেই পারছ, মহিলার অনেক টাকা-পয়সা ছিল, এ ছাড়া তিনি একটা উইল করেও গিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল তাঁর মৃত্যুর পর ঐ টাকা দিয়ে একটা বিরাট হাসপাতাল বানানো হবে। কিন্তু মহিলার যে সত্যি সত্যিই মৃত্যু হয়েছে এমন প্রমাণ না পেলে হাসপাতাল তৈরি কি করে সম্ভব? অনেক বড় বড় আইনজ্ঞ পণ্ডিত পুঁথিপত্র ঘেঁটেও কিছু সুরাহা করতে পারলেন না। তিনি এখনও বেঁচে আছেন না মারা গিয়েছেন—তাও একটা রহস্যই রয়ে গেল।

প্রায় আট বছর পরে একটা গির্জার কাছে মাটি খুঁড়তে গিয়ে একটা নরকঙ্কাল বেরিয়ে পড়ল। অমনি ডাক পড়ল যেখানে যত কঙ্কাল এক্সপার্ট, চলতি কথায় আমরা যাঁদের বলে থাকি কঙ্কাল বিশারদ—তাঁদের। তাঁরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রায় দিলেন—কঙ্কালটি একটি মহিলার, তার বয়স পঞ্চাশ বছর, জাতিতে ইউরোপীয়ান, তাঁর কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের সময় ডানদিকের একটা পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল, বা হাতের বুড়ো আঙুলের পাশে আর একটা ছোট্ট আঙুল গজিয়েছিল কোনও এক সময়, মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে ঐ মহিলাকে প্রায় আট বছর আগে হত্যা করা হয়েছে।

বিত্তশালী ভদ্রমহিলার চেহারার সঙ্গে এই নরকঙ্কালের কোনও তফাত নেই—সকলেই বুঝল ইনিই সেই নিখোঁজ নারী। সে যাই হোক, আদালত তখন আইনসঙ্গত ভাবেই ভদ্রমহিলার সম্পত্তির ব্যবস্থা করে দেয়।

তাহলে বুঝতে পারছ মরা মানুষে কথা বলতে না পারলেও তাদের হাড় কথা বলে এবং বেশ প্রমাণযোগ্য কথাই বলে। একটি নরকঙ্কাল তার নিজের ইতিহাস সবিস্তারে বলে দিতে পারে। মৃত্যুকালে তার বয়স, সে পুরুষ না স্ত্রী, কি কারণে সে মারা গিয়েছিল—এ সব কিছুরই হদিশ সে চমৎকার ভাবে আমাদের বাতলে দিতে পারে। মৃত্যুর পর যদি দেহটাকে সমাধিস্থ করা হয় তাহলে দেহীর মাংসটা শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু কঙ্কালটা সহজে নষ্ট হয় না—ওটা বহুকাল টিঁকে থাকতে পারে।

ফরেনসিক ল্যাবরেটরীতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের অনেক সময়েই এই সব কঙ্কালের হাড় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। অস্বাভাবিক ভাবে কোনও মৃত্যু হলে, খুন-জখম করে কাউকে মেরে ফেললে অথবা দেহে আঘাতের চিহ্ন থাকলে এই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করেন।

কঙ্কাল থেকে কোনও প্রাণীর পরিচয় বের করা খুব সহজ কাজ নয়। কারণ এর ভিত্তি হ'চ্ছে এ্যানাটমি (Anatomy)—দেহের গঠন, অস্টিওলজি (Osteology)—হাড় সম্পর্কীয় বিদ্যা এবং race studies অর্থাৎ কোন জাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে এই মানুষ, তার উপর। এ ছাড়া প্রচুর কঙ্কাল নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর অভিজ্ঞতা থেকে ওটা লাভ করতে হয়। কঙ্কাল বিষয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের তখনই ডাক পড়ে যখন মৃতের হস্তরেখা, গায়ের কোনও দাগ অথবা আর কোনও পরিচয় জানার উপায় থাকে না।

মানুষের দেহ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার কঙ্কালটাও বাড়ে। দেহের অবয়বটাও কঙ্কাল থেকে ধরা পড়ে। এই জন্য কঙ্কালের স্ত্রী-পুরুষ পার্থক্য করা সম্ভব হয়। দেহীর দাঁত, মাথার খুলি, চিবুক প্রভৃতির হাড় থেকে বয়স জানা যায়। দাঁত অনেক দিন মাটির নীচে থাকলেও সহসা নষ্ট হয় না।

যার নাক, মুখ চোখ নষ্ট হয়ে গেছে এমন লাসকে খুনী মোকর্দমায় সনাক্ত করা আগে বড় শক্ত ব্যাপার ছিল। কিন্তু এখন শুধুমাত্র কঙ্কালের চেহারাটা দেখেই কঙ্কাল বিশারদরা লোকটাকে সনাক্ত করে দিতে পারেন। কঙ্কালের হাড় থেকেই তাঁরা বলে দিতে পারেন—কি করে খুন করা হয়েছে। গুলি বা ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ত' সহজেই ধরা পড়ে, এমন কি বিষপ্রয়োগে মৃত্যু হলেও অনেকদিন পরে হাড় পরীক্ষায় তা জানা যায়। নেপোলিয়নের কয়েক গাছা চুল থেকে গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির ডক্টর হ্যামিলটন স্মিথ প্রমাণ পেয়েছেন যে 1820-1921 (নেপোলিয়নের মৃত্যুর বছর) তার উপর অল্প অল্প করে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল।

কেবল কঙ্কালই নয়—জীবাশ্ম অর্থাৎ চলতি কথায় যাকে আমরা ফসিল বলি তাও আজকাল বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলছে। জীবাশ্ম থেকেই এ্যানথ্রোপলজিষ্ট (নৃতত্ত্ববিদ্) বিজ্ঞানীরা তার নাড়ী-নক্ষত্র বলে দিতে পারেন।

জীবাশ্ম নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করে এ্যানথ্রোপলজিষ্টরা বলতে পারেন ঐ জীবাশ্ম কোন প্রাণীর, প্রাণীটি কোন যুগের, জলচর না স্থলচর। তার ফলে কেবল ঐ প্রাণীটিই নয় সেই সঙ্গে অনেক ভৌগলিক তত্ত্বও নতুন করে দেখা দেয়।

কিছুদিন আগে আণ্টার্টিকায় প্রাগৈতিহাসিক 'লিসট্রো-সারাস' নামে একটি উভচর প্রাণীর ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অবলুপ্ত প্রাণীটি প্রায় কুড়ি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে ছিল।

এই ফসিল আবিষ্কার হওয়ার ফলে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে বর্তমান ভারত, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা একসময় আণ্টার্টিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তখন এর নাম ছিল গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। বিজ্ঞানীদের ধারণা কোনও একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড পৃথক হয়ে বর্তমান মহাদেশগুলির পত্তন হয়েছে এবং তারা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। লিসট্রোসারাসের মতো প্রাণী আণ্টার্টিকার চির তুষার রাজ্যে কি করে বাস করত সেটা ভাবনার কথা। সম্ভবত কোটি কোটি বছর আগে আণ্টার্টিকার আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ।

এই জীবাশ্মের মরা হাড় নিয়ে একসময় বিজ্ঞানজগতে যে তুলকালাম কাণ্ড হয়েছিল সেটা তোমাদের না বলে পারছি না। মরা হাড়ের কথা শুনিয়ে সকলকে বোকা বানিয়ে দিয়েছিলেন এক বিজ্ঞানী।

ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স জেলার একটি গণ্ডগ্রাম। গ্রামের নাম পিল্টডাউন। গ্রামের এক জায়গায় মাটি খোঁড়া হচ্ছিল। যারা সেখানে কাজ করছিল অর্থাৎ মজুরেরা, মাটি কেটে ঝুড়ি ভর্তি করে আর এক জায়গায় গিয়ে ফেলে আসছিল। খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ তারা দেখতে পেল ছোট বড় নানান সাইজের পাথরের টুকরো। কুলি মজুরের দল ওটাকে নেড়ে চেড়ে দেখল, কিন্তু ওগুলো যে কি জিনিষ তা বুঝতে না পেরে আবার নিজেদের কাজে মন দিল।

ইতিমধ্যে সেইখানে এসে হাজির হলেন ওই জায়গারই এক উকিল, নাম ডসোন সাহেব। তিনি পাথরগুলো দেখে সঙ্গে সঙ্গে ঐ মজুরদের কাছে প্রস্তাব দিলেন ঐ পাথর কিনে নেবার। মজুরেরা ত' একথা শুনে অবাক। ফেলে দেওয়া পাথর গাঁটের পয়সা খরচ করে আবার কিনে নেয় কে? যাই হোক ওরা এই সুযোগটা ছাড়ল না। খুশী মনে পয়সা পকেটে পুরে তারা বেশ কতকগুলো পাথরের টুকরো সাহেবের হাতে তুলে দিল।

ডসোন সাহেব ওকালতি করলেও উনি ছিলেন একজন এ্যামেচার সায়েণ্টিস্ট। তিনি বুঝেছিলেন ওগুলো সাধারণ পাথর নয়—ফসিল। ফসিলগুলো নিয়ে বেশ কিছুদিন নাড়া-চাড়া করে ডসোন সাহেব এমন তথ্য দিলেন যা শুনে বিজ্ঞান জগতে দারুণ হৈ চৈ পড়ে গেল।

ডসোন সাহেব বললেন—তিনি ঐ ফসিল থেকে প্রাক মানুষ যুগের একটা মাথার খুলি আবিষ্কার করেছেন। মানুষের সঙ্গে যেমন এই খুলির মিল রয়েছে তেমনি মিল রয়েছে বন-মানুষের সঙ্গেও। এই জাতের প্রাণী বহুদিন হল পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছে। ডসোন সাহেব জানালেন যে এরা আমাদের জ্ঞাতি পূর্বপুরুষ হলেও আমাদের মতো মানুষ নয়। বলা যায়—এরা মানুষেরই পথহারা পরমাত্মীয় একধরণের প্রজাতি।

খবরটা চারদিকে রটে যেতে বেশী দেরী হ'ল না। দুনিয়ার যেখানে যত নাম করা নৃতত্ত্ববিদ ছিলেন তারা সবাই ছুটে এলেন ঐ ফসিল পরীক্ষা করতে। ওটা নেড়ে চেড়ে দেখে সবাই সায় দিলেন যে এটা প্রাক-মানুষের মাথার খুলিই বটে। এই ফসিলের বয়স দেড় থেকে দু'লক্ষ বছর। এই প্রাণী এখন আর পৃথিবীতে নেই। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিলেন—'ইয়োআনথ্রোপাস ডসোনী'।

'ইয়োআনথ্রোপাস'-এর অর্থ হ'ল ভোরবেলাকার মানুষ অর্থাৎ একে উষা-মানবও বলা চলে। ডসোন সাহেবের নামও আবিষ্কারক হিসাবে ওই ফসিলের গায়ে জুড়ে দেওয়া হ'ল। লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে ওটা ভাল করে সাজিয়ে রাখাও হ'ল। ডসোন সাহেবের নাম রাতারাতি বিজ্ঞানী হিসাবে বিখ্যাত হয়ে গেল। তাঁর মৃত্যুর পর স্থানীয় লোকেরা তাঁর সমাধির পাশে একটা সুন্দর সৌধ বানিয়ে দিল।

এর প্রায় চল্লিশ বছর পরের কথা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে প্রচুর উন্নতি হয়েছে। নতুন নৃতত্ত্ববিদ্ তরুণ বিজ্ঞানীদের কেমন যেন সন্দেহ হোল ডসোন সাহেবের এই আবিষ্কারের উপর। ঐ খুলির হাড়ের বয়স জানবার জন্যে পরীক্ষা করে ওঁরা বললেন—ও হরি এতো একটা বিরাট চাল মেরেছেন ডসোন সাহেব। মানুষের মাথার খুলির সঙ্গে বনমানুষের চোয়াল কায়দা করে লাগিয়ে তিনি সকলকে বোকা বানিয়েছেন। কৃত্রিম উপায়ে খুলিটাকে যে রং করা হয়েছিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে সেটাও ধরা পড়েছে। ডসোন সাহেব আজ বেঁচে নেই, সত্যিই তিনি দুনিয়ার লোককে ধাপ্পা দিতে চেয়েছিলেন কিনা তাও আজ জানা যাবে না। তবে মড়া হাড়ে যে সব সময় সত্যি কথা বলে চল্লিশ বছর দেরী হলেও সেটা আবার প্রমাণিত হলো।

গর্ভমেণ্ট হাউসিং এস্টেট, সাহাপুর (নিউ আলিপুর)
ব্লক এন, ফ্ল্যাট—7, কলিকাতা-38

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ

বরুণ মজুমদার

যমজ মেয়েঃ লণ্ডন থেকে একটা খবরে বলা হয়েছে যে ব্রেটা ও ফ্রেড্রা চ্যাপলিন নামে দুটি একদম এক রকমের যমজ মেয়ে বৈজ্ঞানিক জগৎ এবং মানুষকে অবাক করে দিয়েছে। তারা শুধুমাত্র দেখতেই একরকম নয়, তারা একসঙ্গে ভাবে একসঙ্গে কাজ করে। এমন কি পোষাকও পরে একই রকমের। তারা মন খারাপ করে এবং চেঁচায় একই সঙ্গে। তাদের দুজনেরই গলার স্বর একই রকমের। সবচেয়ে মজার কথা হল কষ্টে পড়লে দুজনে একই ভাষায় একসঙ্গে কথা বলে। ডাক্তারদের মতে, হয়ত এই দুটি যমজের মধ্যে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ আছে। তারা জানিয়েছেন যে এ বিষয়টা আগে কখনো দেখেননি। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের ইয়র্ক শহরে কিছুদিন আগে শান্তিভঙ্গের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাদের হাজির করা হয়েছিল। সেখান থেকেই তাদের কথা জানা গেছে। মেয়ে দুটির বয়স এখন 38 বছর।

ক্যাঙ্গারু সমাচারঃ—ক্যাঙ্গারুর কথা সবারই জানা আছে। চিড়িয়াখানায় ক্যাঙ্গারুকে অনেকেই দেখেছে পেছনের পা দুটো আর ল্যাজে ভর দিয়ে লাফিয়ে চলতে। তাদের পেটে আছে বাচ্চা রাখার থলি। ক্যাঙ্গারুদের দেখা যায় অস্ট্রেলিয়াতে। এই অস্ট্রেলিয়াতে ক্যাঙ্গারুর সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সেখানে ফসলের অসম্ভব ক্ষতি হচ্ছে। কেননা ক্যাঙ্গারুরা জমির ফসল খেয়ে নিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া সরকার তাই বাণিজ্যিক কারণে সেদেশে 31 লক্ষ 43 হাজার ক্যাঙ্গারুকে মেরে ফেলার অনুমতি দিয়েছেন।

সাপের সঙ্গে মেয়েঃ ভয়ঙ্কর সাপের সঙ্গে বসবাস করে রেকর্ড সৃষ্টি করার ব্যাপারে মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। কেরালার পালঘাটের হাদিজা বিবি এক নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপনের জন্য 101 টি সাপের খাঁচায় ঢুকেছে।

আরশোলার বিরুদ্ধেঃ টোকিওর একজন লোক আরশোলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হেরে গিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। ঐ লোকটি সিগারেটের লাইটার দিয়ে আরশোলা পুড়িয়ে মারতে গিয়ে সারা বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে ফেলেছিল। এই দুর্ভাগ্যের জন্য সে বাড়ী ছেড়ে গিয়ে নিজের কবজি কেটে ফেলে নিজের জীবন দিতে গিয়েছিল।

কিশোর
জ্ঞান-বিজ্ঞান
আয়োজিত
রচনা প্রতিযোগিতার
নিয়মাবলী
আগামী সংখ্যায়
প্রকাশিত হবে।

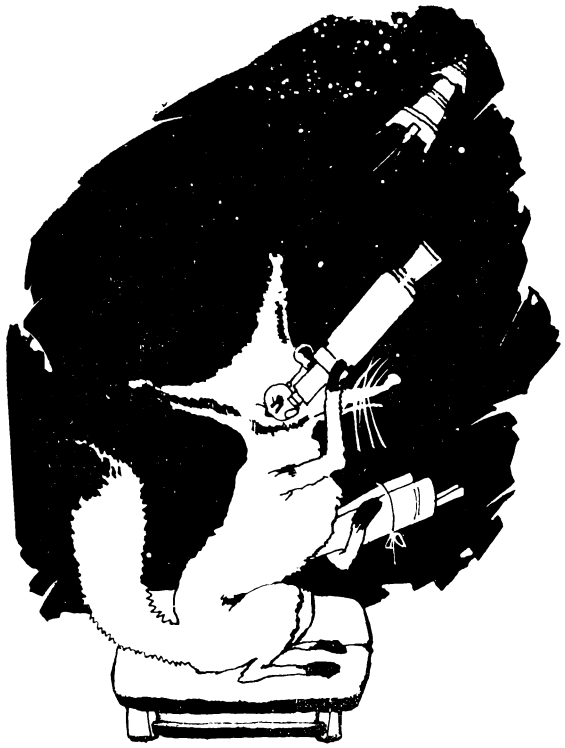

বিবর্তন

সুদীপ্ত দাশগুপ্ত

বিবর্তনের ফলে এখন
সিংহ যাচ্ছে চাঁদে,
নোবেল প্রাইজ পেয়ে গাধা
আটখানা আহ্লাদে!
ঘাস না খেয়ে ঘোড়া এখন ;
করছে কঠিন অঙ্ক,
বাখুমামা বার করেছেন
মাটির গলনাঙ্ক।
শিয়াল মশাই রুটিন মাফিক
আকাশ দেখেন রাতে—
একহাতে তার পাণ্ডুলিপি
দূরবীন আর এক হাতে।
গরু, ছাগল কিংবা ভেড়া
চরছে না কেউ মাঠে,
পাখির এমন বুদ্ধি হ'লো
বেগুন বেচে হাটে।
একটু কারো বিশ্রাম নেই
নানানরকম কাজ যে,
সময় পেলে ঘুরেই এসো
পশুদের এই রাজ্যে।

C/o অশোক দাশগুপ্ত, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

'নলেজ ক্যুইজ' জানুয়ারী 84 সংখ্যার উত্তরদাতাদের নাম

'নলেজ ক্যুইজ' এর প্রশ্ন কি খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে? বর্তমান সংখ্যায় উত্তরদাতাদের নামের তালিকা দেখলে সে কথাই প্রথম মনে পড়ে। এনিয়ে আমরা ভাবছি। তোমরাও তোমাদের অভিমত জানাও। আমরাও 'নলেজ ক্যুইজ' এর প্রশ্নকর্তাকেও বর্তমান অবস্থা জানাব। যেহেতু, উত্তরদাতাদের নামের সংখ্যা কম, তাই আমরা শুধু এই সংখ্যার জন্য সর্ব্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উত্তর দাতাদের, অর্থাৎ সকলেরই নামের তালিকা প্রকাশ করলাম। পরিচালক : ছোটদের দপ্তর।

দশটি প্রশ্নের উত্তর দাতাদের নাম :

জয়দেব সাহা, 13/বি অচ্যুত পাই লেন, কলকাতা-56, বাপী গোস্বামী, 89, কে. পি রায় লেন, কলকাতা-78, দিলীরা বেগম, মন্দিরা ভদ্র, মতিউর রহমান, রামপুরহাট, বীরভূম।

আটটি প্রশ্নের উত্তর দাতাদের নাম :

প্রণব সরকার, সুপর্ণা সরকার, রুমকি সরকার, 24 মল্লিকপাড়া লেন, দমদম, কলকাতা-55

সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাতাদের নাম :

সুমিতা ঘোষ, দীপনারায়ণ, অঞ্জনা দত্ত, আমেদপুর, বীরভূম।

প্রদ্যোৎ কাঞ্জিলাল, 38 জয়শ্রীনগর, কলকাতা-76, প্রবীর, সুবীর ও শান্তনু চক্রবর্তী, শান্তিপুর, নদীয়া।

পিন্টু, কামু, গোপাল ও অভিজিৎ, শান্তিপুর, নদীয়া।

প্রদীপ ও রীতা দেবশর্মা, দেয়াড়া পাড়া, নবদ্বীপ।

ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাতার নাম :

তাপস ও মানসী রীত, নওপাড়া, আমতা, হাওড়া।

চারটি প্রশ্নের উত্তর দাতাদের নাম :

প্রবীর ঘোষ, হাসামপুর, হুগলী।

নলেজ ক্যুইজ

1. কতো সালে পণ্ডিচেরী ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ?
   (ক) 1954 (খ) 1960 (গ) 1956
2. স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন কে ?
   (ক) ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ (খ) ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ
   (গ) চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।
3. আগামী কতো সালে হ্যালির ধূমকেতু আবার দেখা যাবে ?
   (ক) 1999 (খ) 1990 (গ) 1986
4. ভারতের কোন্ হকি খেলোয়াড় প্রথম পদ্মশ্রী খেতাব লাভ করেন ?
(ক) জয়পাল সিং (খ) বলবীর সিং (গ) পৃথ্বীপাল সিং
5. 'হর্স পোলো' খেলায় ব্যবহৃত ব্যাটের নাম কি ?
   (ক) Stick (খ) Mallet (গ) Hammer
6. কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে কোন্ শিলার নাম রাখা হয়েছে ?
   (ক) চ্যালকোপাইরাইট (খ) চার্নকাইট (গ) চেলসাইট
7. কোন্ দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি উপহার দেয় ?
   (ক) ইটালী (খ) ফরাসী (গ) ব্রিটেন
8. দিল্লীর 'কুতব মিনার' কে নির্মাণ করান ?
   (ক) মহম্মদ বিন তুঘলক (খ) ইব্রাহিম লোদী
   (গ) কুতবুদ্দীন আইবাক
9. পুলিকট হ্রদ ভারতের কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?
   (ক) তামিলনাড়ু (খ) কেরালা (গ) পাঞ্জাব
10. ইয়াক (YAK) কি ?
11. কাবেরী নদীর উৎপত্তি হয়েছে কোথা থেকে ?
12. রোমান সংখ্যা LXX এর মান কতো ?

[উত্তর মার্চের 15 তারিখের মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছতে হবে। দশ বা তার বেশী সঠিক উত্তর দাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।]

জানুয়ারী সংখ্যার নলেজ ক্যুইজ-এর সমাধান

1. bis die post cibum, অর্থাৎ দিনে দু'বার খাওয়ার পর সেব্য। 2. কর্ণাটকের ইস্পাত নগরীর নাম 'ভদ্রাবতী। 3. 1889 খ্রীষ্টাব্দে 4. রোডেসিয়া 5. 150 কিলোমিটার 6. Domagk 7. চার্লস ল্যাম্ব 8. ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল 9. ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর 10. Zoroaster 11. ইসরাইল 12. 1964 সালে 13. পাইরোমিটার 14. সম্রাট কনিষ্ক 15. বেলিজ।

জানা-অজানা

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

1, তোতলামীর কারণ কি ?

মুখের ও জিভের মাংসপেশীর উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে তোতলালি প্রকাশ পায়। তোতলামি একটি স্নায়বিক ব্যাধি।

2, 'LIGHTHOUSE' কি ?

সমুদ্রের মধ্যে আলোকস্তম্ভ। অকূল সমুদ্রের মধ্যে জাহাজগুলিকে এই আলোক স্তম্ভ পথ দেখায় এবং অগভীর জল বা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত পর্বতের সঙ্গে সংঘর্ষের হাত থেকে রক্ষা করে।

3, মেরু অঞ্চলে যখন ছয় মাস রাত থাকে তখন সেখানে যে আলো দেখা যায় তার নাম কি ?

'অরোরা বেরিয়ালিস।'

4, ন্যাপথালিন দিলে কাপড় পোকায় কাটে না কেন ?

ন্যাপথালিনে 'ক্রিয়োজোট' এবং কুইনোলিন' নামক দুইটি পদার্থ আছে। এই দুটিই উগ্র ও অ্যান্টিসেপ্টিক জিনিস। এর গন্ধে ও স্পর্শে কাপড় কাটা পোকা মরে যায় বলে তারা এর কাছে আসে না।

5, লঙ্কা ঝাল হয় কেন ?

লঙ্কার ভেতর যেখানে বীচিগুলি আটকানো থাকে সেখানে Glucoside নামে এক রকম জিনিস আছে এবং সেখানে এক রকম তেল আছে। ঐ তেল থেকে লঙ্কার ঝালের উৎপত্তি।

6, জলপূর্ণ গ্লাসের দিকে তাকালে তলদেশ উপরে উঠে আসছে বলে ভ্রম হয় কেন ?

তলদেশের আলোকরশ্মি যখন জলের মধ্য দিয়ে বাতাসে প্রবেশ করে তখন ঐ রশ্মি জলের তলে বেঁকে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। এজন্য গ্লাসের তলদেশ উপরে উঠে আসছে বলে ভ্রম হয়। এই সময় তার গভীরতা $\frac{1}{3}$ অংশ কম বলে মনে হয়।

7, কূপের জল গ্রীষ্ম কালে ঠাণ্ডা ও শীতকালে গরম কেন ?

কূপের জল মাটির অনেক নীচে থাকে এবং গ্রীষ্ম কালের সূর্যের উত্তাপ অত দূর নীচে পৌঁছতে পারে না বলে জল ঠাণ্ডা থাকে। অনুরূপ ভাবে শীত কালে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস খুব নীচে প্রবেশ করতে পারে না বলে কূপের জল গরম থাকে।

হলদি বাড়ী, জেলা—কুচবিহার।

ভেবে ভেবে বল

শুভব্রত রায়চৌধুরী

1. কোলকাতার বিড়লা তারামণ্ডলে তোমরা অনেকেই গেছো। দেখেছো আকাশে গ্রহতারারা কি ভাবে একের পর এক সাজানো আছে। বলতে পারো কোন যন্ত্রের সাহায্যে এই কৃত্রিম আকাশ দেখান হয়।

2. পৃথিবীর সব থেকে কাছের ছায়াপথের নাম কোনটি বল। (ক) ডার্ক ক্লাউড, (খ) ম্যাগেলানিক ক্লাউড, (গ) হোয়াইট নট।

3. 1932 সালে রকেটের ব্যবহার হয়েছিল কোন একটি যুদ্ধ প্রসঙ্গে, কোনটি ঠিক বল? (ক) চীনেরা মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রকেট ব্যবহার করেন, (খ) ভারতীয়রা চীনের বিরুদ্ধে, (গ) আমেরিকা ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে।

4. ছবিতে একটি যন্ত্র দেখান হয়েছে যার সাহায্যে বাঁকান কোন অংশের পরিমাপ করা যায়। যন্ত্রটির নাম ভেবে বলো।

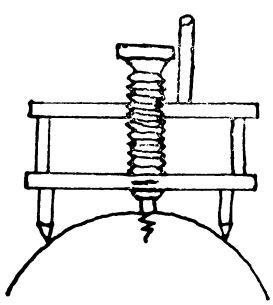

5. কোনটি ঠিক ভেবে বল

1. আলোক বর্ষ = 5 লক্ষ মাইল; 6 লক্ষ মাইল, 7 লক্ষ মাইল।

6. আয়তনে সব থেকে বড় দূরবীন কোথায় আছে ভেবে বল।

(ক) ভারতবর্ষের শ্রীহরিকোটা (খ) ক্যালিফোরনিয়ার মাউন্ট পালোমারে, (গ) মাউন্ট এভারেস্টে।

7. নীচের ছবিটি কিসের ভেবে বলো। ইঙ্গিত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

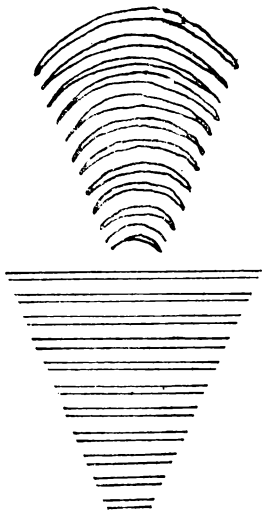

8. নীচের ছবিটি কিসের একটু ভেবে বল?

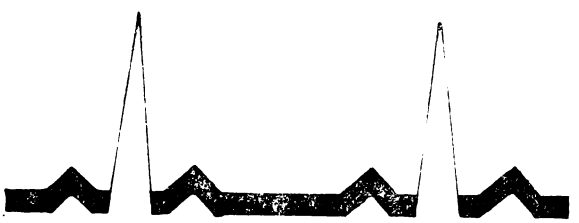

9. পদার্থবিদ্যার ভাষায় তড়িৎ আধান ও মহাকর্ষীয় আধান (ভর) কে এফ আংকিকে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা কার দ্বারা সম্ভব হয়েছিল ভেবে বল।

10. নীচের ছবিটি কিসের ভেবে বলো।

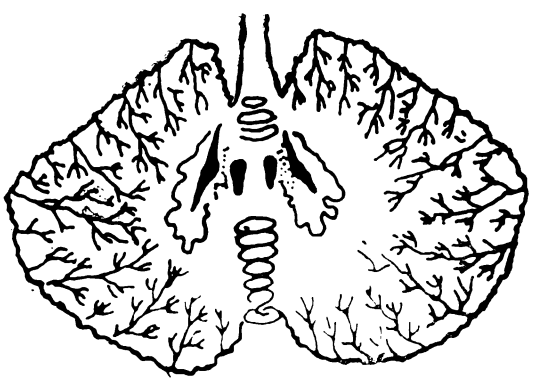

প্রশ্নোত্তর

উত্তর দিয়েছেন ঃ অজয় চক্রবর্তী

প্রশ্ন ঃ আমার বন্ধু আমাকে একটা ম্যাজিক দেখালো। বন্ধুটি একটি পাতলা কাগজ ভাঁজ করে একটি বাটির মতো করলো এবং ঐ কাগজের বাটিতে সাবধানে জল ভরে জ্বলন্ত স্টোভে চাপিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর জল ফুটতে শুরু করলো। কিন্তু আশ্চর্য! কাগজটা একটুও পুড়লো না। কী করে এটা সম্ভবপর হলো?

(কাঞ্চন মুখার্জী, বর্ধমান)

উত্তর ঃ ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ ম্যাজিক নয়। তাপ-পরিবহন সম্পর্কিত সূত্র থেকে ঘটনাটির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমরা জানি, কোন মাধ্যমের দুই পৃষ্ঠের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য থাকলে কোন নির্দিষ্ট সময়ে এক পৃষ্ঠ থেকে অন্য পৃষ্ঠে যে-পরিমাণ তাপ পরিবাহিত হয় তা ঐ দুই পৃষ্ঠের ব্যবধানের দূরত্বের) ব্যস্তানুপাতিক হয়। মাধ্যমটি যতো পাতলা হবে, অর্থাৎ দুই পৃষ্ঠের মধ্যে ব্যবধান যত কম হবে, তাপের পরিবহনের হার ততো বেশি হবে। পাতলা কাগজের বাটিতে জল নিয়ে স্টোভের ওপর ধরলে কাগজের দুই পার্শ্বে উষ্ণতার ব্যবধান প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে স্টোভ থেকে জলের দিকে তাপ প্রবাহিত হতে থাকবে। কাগজ পাতলা হওয়ায় তাপ দ্রুত পরিবাহিত হয়ে জলের মধ্যে চলে যায়। এ সময় কাগজে বেশি তাপ জমা হতে পারে না বলে কাগজ দহনাঙ্কে পৌঁছায় না। তোমার বন্ধু যদি মোটা কাগজ ব্যবহার করতো তাহলে কিন্তু তার পরীক্ষা সফল হতো না। সে-ক্ষেত্রে জল ফুটতে শুরু করার আগেই কাগজ পুড়ে যেতো।

প্রশ্ন ঃ এক আলোক বর্ষ বলতে কতটা দূরত্ব বোঝায়?

(বিশ্বজিৎ সরকার, কলিকাতা)

উত্তর ঃ শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে আলোক বর্ষ বলা হয়। আমরা জানি, শূন্যস্থানে আলোর বেগ সেকেণ্ডে 3×10^5 কিলোমিটার।

কাজেই, 1 আলোকবর্ষ $= 3 \times 10^5 \times 60 \times 60 \times 24 \times 365$ কিলোমিটার $= 95 \times 1011$ কিলোমিটার (প্রায়)

প্রশ্ন ঃ আকাশে উঁচু দিয়ে এরোপ্লেন গেলে মাটিতে ছায়া পড়ে না কেন?

(কাজল ভট্টাচার্য, কলিকাতা)

উত্তর ঃ আলোর উৎস যখন অস্বচ্ছ বস্তুর চেয়ে আকারে বড়ো হয় তখন উৎপন্ন প্রচ্ছায়াটি শঙ্কু-আকৃতির হয়। এরোপ্লেন যখন আকাশে অনেক উঁচু দিয়ে ওড়ে তখন এরোপ্লেনের প্রচ্ছায়া শঙ্কুটি মাটি স্পর্শ করার আগেই শেষ হয়ে যায়। এর ফলে মাটিতে এরোপ্লেনের ছায়া পড়ে না।

প্রশ্ন ঃ টিউব-লাইটকে 'ছায়াহীন বাতি' বলা হয় কেন? টিউব-লাইট জ্বাললে ছায়া হয় না কেন?

(রজতকুমার মহান্ত, ধানবাদ)

উত্তর ঃ টিউব-লাইটকে একটি রেখা বরাবর অবস্থিত অসংখ্য ক্ষুদ্র উৎসের সমষ্টি হিসেবে কল্পনা করা যায়। টিউব-লাইটের একাংশ থেকে নিঃসৃত আলো কোন অস্বচ্ছ বস্তুতে বাধা পেলে যে অঞ্চলে ছায়া পড়ে টিউব-লাইটের অন্য অংশ থেকে নিঃসৃত আলো সে অঞ্চলকে আলোকিত করে। ফলে এক্ষেত্রে ছায়া গঠনের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

জানুয়ারী সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান

	1 ফ	2 নি	3 ম	4 ন	সা	
5 লু		6 ম	য়ূ	র		7 সি
8 ই	ট		রী		9 সি	ন্ধু
10 পা	ই	ন			কা	ঘো
11 স্তু	ব		12 রো		13 গো	ট
র		14 পা	15 বো	16 ড্রা		ক
	17 ক্যা	রা	ট	18 কো	ট	

বিংশ শতাব্দীর বিস্ময় ঃ শব্দোত্তর শব্দ

ইন্দ্রনীল ঘোষ

বহু যুগ আগে যখন মানুষ বনে বাস করতো তখন কি তারা চিন্তা করতে পেরেছিল যে তাদেরই উত্তর পুরুষেরা পৃথিবীতে এক নতুন যুগের সুচনা করবে। বিজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা এমনটা ঘটাতে পেরেছি। আজ, এই বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান রচনা করেছে এক নতুন অধ্যায় শব্দোত্তর শব্দ। অর্থাৎ Supersonic Sound.

বিংশ শতাব্দীতে অসম্ভব বলতে আর কিছু নেই। আজকাল বিলেতে মোটরগাড়ীর সঙ্গে একটা শব্দোত্তর শব্দপ্রেরক যন্ত্র লাগানো থাকে। এটা দেখতে একটা পেন্সিলের মত। গাড়ী চালক গাড়ীতে বসে গ্যারেজের দরজা লাগান আর একটা যন্ত্রে এসে পৌঁছায়। তখন একটা যান্ত্রিক নিয়মে গ্যারেজের দরজা খুলে যায়। তখন চালক গাড়ী নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে এবং দরজা আবার বন্ধ হয়ে যায়।

এখন এই শব্দোত্তর শব্দ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। যখনই কোন কিছু থেকে শব্দ বের হয়, একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে জিনিসটা কাঁপছে। এই কম্পনের সংখ্যা দিয়ে নানা রকম শব্দের মধ্যে সীমারেখা টানা যায়। যে কম্পন সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে 20 সাইকেল থেকে 20,000 সাইকেল হয় তা আমরা কানে শুনতে পাই। যদি এই কম্পন সংখ্যার কম বা বেশী কম্পন হয় তবে আমরা তা শুনতে পাই না। যে কম্পন সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে 20,000 সাইকেল-এর বেশী হয়, সেই কম্পনের থেকে উৎপন্ন শব্দকেই বলে শব্দোত্তর শব্দ।

বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসী জাহাজ সব-থেকে জারমান সাবমেরিনগুলো দ্বারা বেশী ক্ষতিকর হত বলে ফরাসী বৈজ্ঞানিক Paul Langenin শব্দোত্তর শব্দকে কাজে লাগান। ফরাসী জাহাজ গুলো থেকে সমুদ্রের জলের মধ্যে শব্দোত্তর শব্দ পাঠান হত। এখন সেই শব্দ যদি সাব মেরিনের গায়ে লেগে তাড়াতাড়ি ফিরে আসত তা Hydrop pone নামক একটা যন্ত্রের সাহায্যে ধরা যেত। তখনই সাব মেরিনের অস্তিত্ব জানতে পেরে ফরাসী জাহাজ গুলো সাবধান হয়ে যেত।

শব্দোত্তর শব্দের সাহায্যে আজকাল সমুদ্রের গভীরতা মাপা যায়। জলের ঠিক উপর থেকে Magne tostritine প্রেরক যন্ত্রের দ্বারা শব্দোত্তর শব্দ জলের মধ্যে পাঠান হয়। সেই শব্দ জলের তলদেশে গিয়ে আবার ফিরে আসে এবং এই শব্দোত্তর শব্দের আসা যাওয়ার মোট যে সময় লাগে তার অর্ধেক লাগে শুধু সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছতে। শব্দের গতিবেগ থেকে সমুদ্রের গভীরতা বের করা যায়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে শব্দোত্তর শব্দের অবদান অসমান্য। Diphtheria রোগের ফল প্রায় সকলেই জানেন। এর জন্য খুব ভাল ওষুধও কম। কিন্তু শব্দোত্তর শব্দের সাহায্যে এই রোগকে করেক মিনিটের মধ্যে ভাল করে দিচ্ছে।

গলায় কফ জমে গিয়ে এ রোগের সৃষ্টি হয়। এতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে রোগীর খুব কষ্ট হয় এবং রোগী পরে মারা যায়। কিন্তু গলায় শব্দোত্তর শব্দকে পাঠালে ঐ কফ্ ছোট ছোট টুকরোয় পরিণত হয় এবং তা সহজে বের হয়ে যায়, টিউমারের ক্ষেত্রে আজকাল শব্দোত্তর শব্দকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এর দ্বারা টিউমারের অবস্থান এবং আকৃতি সম্পর্কে সঠিক খবর পাওয়া যায়। X Ray-এর সাহায্যে আমরা হাড়ের ভেতরে কিছু হলে জানতে পারি না। শুধু ভেতরে কিছু হলে জানতে পারি। তাই হাড়ের ভিতর কিছু হলে শব্দোত্তর শব্দ দ্বারা জানা যায়।

সমুদ্রে মাছ ধরতে শব্দোত্তর শব্দ খুব ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রে মাছেরা সবাই দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করে। প্রথমে পরীক্ষাগারে একটা চৌবাচ্চায় জলের ভিতরে কিছু মাছ রাখা হয় এবং Oscillograph নামক একটা যন্ত্রের দ্বারা ফটো নেওয়া হয় যাতে মাছের কোন আকৃতি থাকে না। থাকে শুধু কিছু রেখার সমষ্টি। এই ফটো নিয়ে সমুদ্রে যাত্রা করা হয় এবং মাঝে মাঝে শব্দোত্তর শব্দ জলের ভেতরে পাঠানো হয়। মাছের উপর এই শব্দ পড়লে Oscillograph-এর পর্দায় ফটো দেখতে পাওয়া যায়। পরীক্ষাগারের ফটোর সঙ্গে যদি ঐ ফটো মিলে যায় তবে বোঝা যাবে যে সেখানে মাছ আছে। তখন মাছ সংগ্রহ করতে আর অসুবিধে হয় না।

প্রত্যেক বড় বড় শহরেই কলকারখানা আছে, কারখানার ধোঁয়া নাগরিকদের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর। তাই উন্নত দেশগুলোতে ধোঁয়া থেকে বাঁচবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা শব্দোত্তর শব্দের সাহায্য নিয়েছেন। কারখানার ধোঁয়ার সঙ্গে থাকে কিছু জলীয় বায়ু। শব্দোত্তর শব্দকে ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে চালনা করলে ধোঁয়ার কণাগুলো দানা বেঁধে যায়। সেগুলো আর তখন বাতাসে ভেসে থাকতে পারে না মাটিতে পড়ে যায়।

গৃহকার্যেও আজকাল শব্দোত্তর শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। বিদেশে কাপড় ধোবার জন্য শব্দোত্তর শব্দকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আজ এই শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকরা শব্দোত্তর শব্দকে জনকল্যাণমূলক কাজে লাগিয়ে মানুষের সুখসুবিধা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের নবতর গবেষণা মানব জীবনের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে বৃহত্তর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবে সন্দেহ নেই।

নর্থ বুক জুট মিল কং লিমি, (কম্পাউণ্ড) চম্পাদানী, বৈদ্যবাটী, হুগলী।

সামনে পরীক্ষা ছিল, তাই রসায়ন বই-এ 'পরমাণুর গঠন' অধ্যায়টি পড়ছিলাম আর মাঝে মাঝে মনে আছে কিনা বই না দেখে তা'জানার চেষ্টা করছিলাম। এরকম করতে করতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লাম।

...হঠাৎ মনে হল আমি কোথায়? আমি এক বড় হল ঘরে বন্দি। আমার হাত পা বাঁধা। আমাকে ঘিরে কয়েকজন রোবট। সামনে সভাপতি বসে আছেন; তাঁর চারিদিকে কয়েকজন রোবট। সভাপতির সামনে একটা কাগজ আছে তা'তে রোবটদের নাম স্বাক্ষর করা আছে—ডাল্টন, টমসন, গোল্ডস্টাইন, স্যাডউইক, র‍্যাদারফোর্ড, বোর, সডি, হাইমার প্রভৃতি। সভাপতির পেছনে একটা কাগজে লেখা আছে—"ভবিষ্যৎ পৃথিবী ও আমরা।"

সভাপতি ডালটনের অনুমতি নিয়ে টমসন বলতে লাগল: মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্রবৃন্দ। আজ আমরা যে সম্মেলনের আয়োজন করেছি তার বিষয় হ'ল "ভবিষ্যৎ পৃথিবী ও আমরা"। এই বিষয়টা অতি গুরুত্বপূর্ণ। দেখুন, আমরা শুধু মানুষের উপকার করি, তাদের বৈজ্ঞানিক কাজে সাহায্য করি, কিন্তু মানুষ আমাদের দেহে প্রাণসঞ্চার করে না। কারণ, আমাদের দেহে প্রাণ সঞ্চার করলে ভবিষ্যতে আমরা মানুষদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিন্ন করি, এই আতঙ্ক।

গোল্ডস্টাইন উঠে বলতে লাগল: না, মানুষ আসলে এত বড় হতে পারেনি যে আমাদের দেহে প্রাণসঞ্চার করবে। আমাদের দেহেই যদি প্রাণসঞ্চার করতে পারতো তা'হলে এত বড় বড় বিজ্ঞানীরা মারা যাচ্ছেন; তাঁদের দেহে তো প্রাণসঞ্চার করতে পারে।

সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন: আপনাদের আলোচনা অন্য পথে যাচ্ছে। আপনারা আসল বিষয়ের দিকে নজর দিন।

স্যাডউইক বলতে লাগল: পৃথিবী ক্রমে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে যতগুলো পরমাণু বোমা তৈরী হয়েছে তাতে আমরা ছাড়া আর কেউই পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আচ্ছা, আমরা তো বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক কাজে সাহায্য করি, কাজেই আমরা এক এক জন বিজ্ঞানী। আমরা এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারি না, যা দিয়ে পরমানু বিস্ফরণকে রোধ করা যাবে।

র‍্যাদারফোর্ট বলতে লাগল: আমি এই যন্ত্রটার নাম রাখলাম ম্যাড (M. A. D)। তবে ম্যাড মানে পাগল নয়। এর সম্পূর্ণ নাম-The Machine of Atom Damage.

সভাপতি বল্লেন: আগে যন্ত্রটা তৈরী হোক, তারপর অন্য কথা।

বোর বলতে লাগল: দেখুন, মানুষ যদি পরমাণু বোমাকে উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যবহার করে তা'হলে তো কোন চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা যাবে কি ভাবে?

সডি বলতে লাগল: মানুষ শুধু পরমাণু বোমা তৈরী করে পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেনা। সে বন জঙ্গল কাটছে, পশুপাখী নিধন করছে, নতুন নতুন

কলকারখানা স্থাপন করছে। ফলে পরিবেশ দুষিত হচ্ছে, অভিব্যক্তি নষ্ট হচ্ছে। ফলে মানব সমাজ ভবিষ্যতে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে মানুষ সচেতন হ'লে এর থেকে বাঁচার উপায় আছে।

টমসন বলতে লাগল ঃ এ সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন তা'হলে ভাল হতো।

সডি বলতে লাগল ঃ মানুষকে আরও গাছ লাগাতে হবে; গাছকে রক্ষা করতে হবে; পশুপাখীর জন্য অভয়ারণ্য তৈরী করতে হবে। লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের রক্ষা করতে হবে এবং পরিবেশ সম্বন্ধে সকল মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে।

সভাপতি বলতে লাগলেন, আপনারা কি এ ব্যাপারে অর্থাৎ ম্যাড তৈরীর ব্যাপারে গবেষণা করছেন?

হার্ইমার বলতে লাগল ঃ আমি এ ব্যাপারে গবেষণা করছি এবং অনেকটা এগিয়েছি। সকলে একসঙ্গে বলতে লাগল ঃ ম্যাড সম্বন্ধে কিছু বলুন না।

হার্ইমার আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল ঃ ঐ মানুষটা আছে তো তাই এখন বলা যাচ্ছে না।

টমসন, বোর, সডি আমার কাছে এসে বললঃ দেখ, তোমার জন্য আমরা ম্যাড সম্বন্ধে জানতে পারছি না।

আমি বল্লাম ঃ আমি কাউকে বলব না; বা ম্যাড তৈরী করব না। তখন সকলে সম্মত হ'ল।

হার্ইমার বলতে লাগল ঃ প্রথমে আমি···

হঠাৎ মা ডেকে উঠলেন ঃ ওরে পল্লব ওঠ, ভোর হয়ে গেছে। তুই না বলেছিলি ভোরে উঠে পড়াশুনা করবি। মার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। মার উপর খুব রাগ হ'ল। কারণ, মা না ডাকলে আমি ম্যাড যন্ত্র তৈরীর কৌশলটা জেনে ফেলতাম। ফলে পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু তা আর হ'ল না।

যাক এব্যাপারটা তো জানতে পারলাম মানুষরা পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার চন্তা না করলেও রোবটরা চিন্তা করে।

পলাশী পাড়া, এম. জি. স্মৃতি এইচ. এস. বিদ্যাপীঠ, নদীয়া

শব্দকুট

দেবাশিস কর

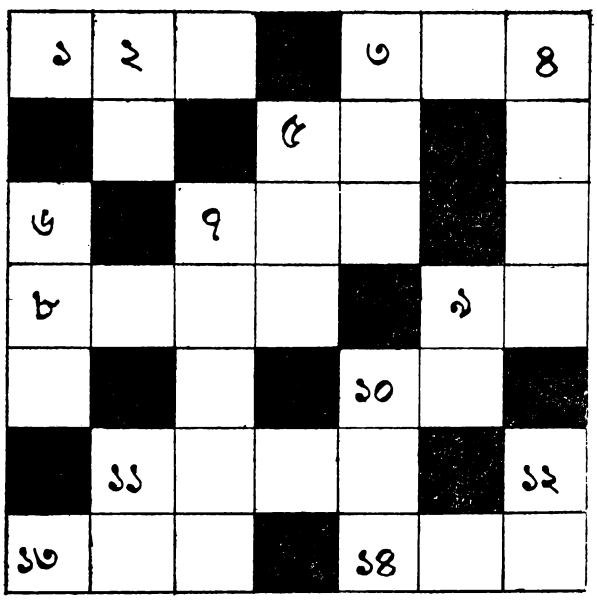

পাশাপাশি ॥ 1. "কোয়াড্রিভ্যালেন্স অফ্ কার্বন" এবং "বেঞ্জিন রিং" এর ওপর যে জার্মান রসায়নবিদের মতবাদ যুগান্তকারী; 3. জীববিজ্ঞানীদের মতে পুরোপুরি উদ্ভিদও নয়, প্রাণীও নয়; 5. পারমাণবিক শক্তির গবেষণায় ভারতকে যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন; 7. হাইড্রলিক প্রেস ও হাইড্রালিক জ্যাক যে ফরাসী বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত সূত্রের ভিত্তিতে কাজ করে; 8. গ্রহের গতি সম্বন্ধীয় সূত্রসমূহ বিবৃত করেন যে বিজ্ঞানী; 9. গুঁড়ো গুঁড়ো শুকনো বরফ, যা শৈত্য অঞ্চলে মাঝে মাঝে ঝরে পরে; 10. সিপিয়া, অক্টোপাস, ললিগো প্রভৃতি শামুকজাতীয় প্রাণী যে বিশেষ গতিতে গমন করে; 11. প্রোটিনযুক্ত এই উদ্ভিজ্জ খাদ্যটিতে ভিটামিন B-কমপ্লেক্স ছাড়াও টোকোফেরল এবং ফাইলোকুইনানও পাওয়া যায়; 13. 2 এবং 4—উভয় যোজ্যতাই দেখা যায় এমন একটি মৌল; 14. রাত্রে আকাশের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে।

উপর নিচ ॥ 2, 1878 খৃষ্টাব্দে যে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম 'এনজাইম' কথাটি ব্যবহার করেন; 3. সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষ থেকে উৎপন্ন প্রস্তরসদৃশ পদার্থ; 4. পিঞ্জর অস্থি ও বক্ষ কশেরুকা ছাড়াও থোরাসিক কেজ-এ যেটি বিদ্যমান; 5. ভারতের দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ, 6. ক্যালসিফেরলের অভাবে বাচ্চারা এই রোগে আক্রান্ত হয়; 7. 1803 খৃষ্টাব্দে ওলাস্টন আবিষ্কৃত এই মৌলটির নিউক্লিয়াসের বহির্দেশে 46 টি ইলেকট্রন দেখা যায়; 9. বস্তুস্থিত অনুসমূহের গতিশক্তির ফলেই এর উদ্ভব; 10. একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস; 11. অম্লরাজে দ্রবীভূত হয়, এমন একটি ধাতু; 12. প্রাণীদেহের নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ।

ঠাকুর বাটী স্ট্রীট, বল্লভপুর, শ্রীরামপুর, হুগলী

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা
ধীরেন বল
নদীর জলও দূষিত হয় বললি, নদী ত বহমান, বদ্ধজলা নয়।
ঠিক! কিছু আবর্জনা, কিছু মৃত প্রাণী ভেসে যায়, যায় সমুদ্রে।
সুতরাং নদীর জল সহজে দূষিত হয়না। অসম্ভব!
বড় নদীর জলও কীকরে দূষিত হয় দেখবে এসো!
এটা বড় সহরের উপকন্ঠ। বহু কল-কারখানা গজিয়ে উঠেছে।
জানি এরা ধোঁয়ায় বায়ু দূষিত করে!
জলও দূষিত করে।
এইত একটা কারখানা
এখানে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হয়।
এসবে আমাদের প্রয়োজন মেটায়।
এখান থেকে নোংরা যা আবর্জনা বেরোয়, নালো দিয়ে তা চলে যায় কোথায়?
পড়ে এসে এই নদীতে।
ওসব বিষ বলতে পারো!

ভ্রমণ ও অভিযান

বীরেন্দ্রলাল ধর ॥ দুরন্ত যাত্রী
২য় সংস্করণ, ১৯৮১ পৃঃ ৯৯ দাম ৮.০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ গঙ্গা যমুনা
১ম সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ৭২ দাম ৮.০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুন্দরবনে সাত বৎসর
৩য় সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ১১২ দাম ৮.০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু ॥ হঠ যাও হার্মাদ
১ম সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ৭২ দাম ৮.০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ আমাজনের অরণ্যে
২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ পৃঃ ৯৬ দাম ৮.০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নীল তিমি
২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ পৃঃ ৯৬ দাম ৮.০০

শিশির ঘোষ ॥ লাহুলসিংহের সন্ধানে
১ম সংস্করণ, ১৯৭৫ পৃঃ ৮২ দাম ৬.০০

সুনির্মল বসু ॥ রোমাঞ্চের দেশে
নতুন মুদ্রণ, ১৯৮৩ পৃঃ ৫৬ দাম ৬.০০

রহস্য, রোমাঞ্চ, ভৌতিক গল্প

হেমেন্দ্র কুমার রায় ॥ ভৌতিক গল্প
নতুন সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১০৫ দাম ১০.০০

আনন্দ বাগচী ॥ মুখোশের মুখ
১ম সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১১৫ দাম ৮.০০

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ মোহনপুরের শ্মশান
নতুন সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ৫৪ দাম ৫.০০

দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ যখের আসন
২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ পৃঃ ১১২ দাম ৮.০০

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ॥ কিশোর রহস্য গল্প
১ম সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১১৬ দাম ৮.০০

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ যক্ষপতির রত্নপুরী
নতুন সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ৯২ দাম ৬.০০

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ॥ কিশোর রোমাঞ্চ গল্প
১ম সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১১২ দাম ৮.০০

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ॥ কিশোর গোয়েন্দা গল্প
২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ পৃঃ ১১৬ দাম ১০.০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

RNo 37390/81 KISHORE JAN,BIJNAN 3rd year, February 1984 Regd NO WBCC/50

ছোটদের বই

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

অমরনাথ রায়
সংখ্যা নিয়ে খেলা ৮·০০
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা ৫·০০
সায়েন্স ক্যুইজ ১০·০০

সমরজিৎ কর
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১৫·০০
সমুদ্রের সম্পদ ৮·০০

অমলরতন ভট্টাচার্য
রোবোট এল কেমন করে ৬·০০

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৬·০০

সিদ্ধার্থ ঘোষ
স্যাম লয়েড ও লুইস ক্যারোলের ধাঁধা ১০·০০

ফ্যান্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ৮·০০
ঘনাদার জুড়ি নেই ৮·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
চারমূর্তি ৮·০০
ঝাউবাংলোর রহস্য ৮·০০
কম্বল নিরুদ্দেশ ৬·০০

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
গুপী গাইন বাঘা বাইন ৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
হাতিচোর ৮·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ৮·০০

বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প

লীলা মজুমদার
কল্প-বিজ্ঞানের গল্প ১৫·০০

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
লুপ্তধন ৮·০০
কুয়াবলোকের রহস্য ৮·০০
মেঘনাদ ১০·০০

অদ্রীশ বর্ধন
কিশোর সায়েন্স ফিকশান ১৫·০০

শৈব্যা প্রকাশন
৮/১এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলকাতা ৭৩

কিশোর ক্ল্যাসিকস

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
রাজকাহিনী, বুড়ো আংলা ও হানাবাড়ির কারখানা তিনটি বই একমলাটে

তেপান্তর ১৫·

প্রেমেন্দ্র মিত্রর
ঘনাদার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত খনার বচন, গল্প নাটক ও উপন্যাসের বিচিত্র সমাহার
ঘনাদা বিচিত্রা ১২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-র
অপুর ছেলেবেলা, ছোটদের অপরাজিত ও তারাদাস বন্দ্যোর কাজল— ৩টি বই একসঙ্গে ১৪

কিশোর অপু

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিণ্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুইটাকা পঞ্চাশ পয়সা।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেস ১৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬